চতুর্থ অধ্যায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে হাস্যরস

(১)

বাংলা ছোটগল্পের আরেকজন বিশিষ্ট হাস্যরসের শিল্পী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় যিনি বনফুল ছদ্মনামে আমাদের কাছে পরিচিত। উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদি নানা শাখায় অবাধে বিচরণ করলেও ছোটগল্পই ছিল তাঁর যথার্থ বিচরণক্ষেত্র। সমকালীন সাহিত্যধারার প্রচলিত পথে পা না বাড়িয়ে অভিনব নির্মাণকলা ও রচনার চমৎকারিত্বের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে পদসঞ্চারের একটি ভিন্ন পথ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন তিনি। বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেই সাহিত্য-শিল্পের নব নব পরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন বলাইচাঁদ এবং মাতিয়ে তুলেছিলেন বাঙ্গালী পাঠককুলকে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই (৪ শ্রাবণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় মণিহারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন বলাইচাঁদ। হুগলি জেলার শিয়ালখানা গ্রামে ছিল তাঁর পরিবারের আদি নিবাস। বলাইচাঁদের পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় ডাক্তার। মা মৃণালিনী দেবী ছিলেন পেশায় গৃহবধূ। বলাইচাঁদ তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁরা ছয় ভাই এবং দুই বোন। খুব ছোটবেলা থেকেই বলাইচাঁদ ছিলেন একটু দুরন্ত প্রকৃতির, সঙ্গে ছিল একটি কৌতূহলী মন। এই কৌতূহলী মন নিয়ে 'পথের পাঁচালী'র অপুর মত ঘুরে বেড়াতেন তিনি। প্রকৃতির অজানা জগৎ তাঁর কাছে ছিল সদা রহস্যময়। ছেলেবেলা থেকেই নিজের অন্তরে এই অজানা রহস্যময় জগতের রহস্যভেদ করার আহ্বান অনুভব করতেন তিনি। বলাইচাঁদ নিজেই তাঁর 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে জানিয়েছেন :

> ''আমাদের বাড়ীটা গ্রামের বাহিরে একটি 'বুনো' জায়গায় অবস্থিত ছিল। কাছে ছিল পীড়বাবার পাহাড়। পীড়বাবার পাহারের চারিদিকে বেশ জঙ্গল ছিল। শুনিয়াছি, আমাদের বাড়ীর উঠানের ভিতর দিয়া বন্য খরগোস, সাপ, এমনকি বন্য শূকর পর্যন্ত যাতায়াত করিত। একবার একটি নেকড়ে বাঘও নাকি বাহির হইয়াছিল।''[১]

বলাইচাঁদের কাছে এই জঙ্গল হয়ে উঠেছিল রূপকথার এক রহস্যময় জগৎ। কাছেই ছিল গঙ্গা নদী। নদী, পাহাড়, জঙ্গল সম্বলিত এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল বলাইচাঁদের। আর এর ফলে শৈশব থেকেই বলাইচাঁদের ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত হয়েছিল এক প্রগাঢ় হৃদয়বত্তা ও প্রত্যয়বোধ।

বলাইচাঁদের ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর পরিবারের অবদান ছিল সবথেকে বেশী। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উদার মতাবলম্বী, সর্বসংস্কারমুক্ত এবং বন্ধুবৎসল। আত্মীয় পরিজন, চাকর-বাকর এবং পশু-পাখী নিয়ে ছিল তাঁদের বিশাল একান্নবর্তী পরিবার। এরকম একটি একান্নবর্তী পরিবারে উন্মুক্ত খোলা হাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন বলাইচাঁদ। সত্যচরণের সাহিত্যপ্রীতিও ছিল উল্লেখ করার মত। সেই সময়ের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় মুখ্য পত্রিকাগুলি তাঁর বাড়িতে নিয়মিত আসত। 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন তিনি। এই সাহিত্য পত্রিকাগুলির সূত্রেই বলাইচাঁদ শৈশব থেকে নিজেরই অজান্তে সাহিত্যকে ভালোবেসে ফেলেন। শুধু পিতা নন, মা মৃণালিনী দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বলাইচাঁদের চরিত্র গঠনে অনেকটাই সহায়তা করেছিল। স্বামী সত্যচরণের মত তারও ছিল একটি উদার মন। নিজে রক্ষনশীল ব্রাম্মণ পরিবারের সদস্য হলেও সংস্কারের গন্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করেননি তিনি। শিশু বলাইচাঁদকে তিনি তাঁদের বাড়ির মুসলমান ক্ষেতমজুর চামরুর স্ত্রীর বুকের দুধ খেতে দিয়েছেন, নিজ হাতে রুগ্ন ছেলেকে মুরগীর মাংসও রান্না করে দিয়েছেন। অতএব বলাইচাঁদ শৈশব থেকেই একটি উদার চেতনার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, যা তাঁর মনের নেপথ্যে এক কড়া ও তীক্ষ্ণ নীতির মানদন্ড গড়ে দিয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হওয়ার সুবাদে অসংখ্য চরিত্র ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। পারিবারিক জীবন থেকে আহৃত এই অভিজ্ঞতার বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে। ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল লক্ষ করা যায়।

বাল্যকালে বলাইচাঁদের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। শুনেই অনেক জিনিস মনে রাখতে পারতেন তিনি। নিজের স্মৃতিশক্তির কথা বলতে গিয়ে 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে বনফুল বাল্যকালের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। একদিন স্কুলের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টার বনফুলের বাড়িতে এসে হাজির হন :

> ''তিনি যখন আসিয়া ছিলেন বাবা বাড়িতে ছিলেন না। আমি বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একটি মোটা বই হইতে উচ্চৈ:স্বরে কবিতা পাঠ করিতেছিলাম। এতটুকু ছেলে এত মোটা বই হইতে গড় গড় করিয়া আবৃত্তি করিতেছে দেখিয়া তিনি বেশ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কাছে আসিয়া দেখিলেন, বইটি আমি উল্টা করিয়া ধরিয়া আছি। আমাদের বাড়িতে একজন রামায়ণ পাঠ করিতেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ। শুনিয়া শুনিয়া আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তখনও আমি পড়িতে শিখি নাই। বাবার সহিত ইন্সপেক্টর মহাশয়ের যখন সাক্ষাৎ হইল তিনি বলিলেন—'ইহাকে এখন স্কুলে ভর্তি করিবেন না। বেশী পড়ার চাপ দিলে পাগল হইয়া যাইতে পারে।'''[২]

সেই স্কুল ইন্সপেক্টরের কথা মত নয় বছর বয়সে বলাইচাঁকে মাইনর স্কুলে ভর্তি করানো হয়। স্কুলের হেডমাষ্টার চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর কাকাবাবু। স্কুলে বলাইচাঁদ ছাত্র হিসেবে প্রথম দিন থেকেই সকলের নজড় কারতে থাকেন। মাইনর পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন। এরপর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাই স্কুলে ফোর্থ (সপ্তম শ্রেণী) ক্লাসে ভর্তি হন।

সাহেবগঞ্জের এই পর্ব বলাইচাঁদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্ব। কেননা এই সময়ে বনফুলের মনে সাহিত্য প্রেরণা ভীষণভাবে জেগে উঠেছিল। অবশ্য এর আগেই বনফুল দুএকটি কবিতা রচনা করেছেন। বাল্যকালে ছোট ভাই ভোলানাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে পয়ার ছন্দে তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেছেন 'ময়ূর'। এ কবিতা রচনা করতে গিয়ে বনফুলের যে প্রতিভার প্রকাশ ঘটে তাঁর বিকাশ শুরু হল সাহেবগঞ্জে এসে। থার্ড ক্লাসের (অষ্টম শ্রেণীর) ছাত্র থাকার সময় বনফুল 'বিকাশ' নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বের করেন। বনফুল জানিয়েছেন :

> ''সাহেবগঞ্জে বোর্ডিং-এ আসিয়া ঠিক করিলাম এবার একটা হাতে-লেখা মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। সেকালে বেশ ভালো একরকম ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ পাওয়া যাইত। তাহাই দুই ভাঁজ করিয়া একসারসাইজ বুকের মতো আয়তন হইত। ঠিক করিলাম এই মাপেরই কাগজ করিব। কাগজের নাম দিলাম 'বিকাশ।''[৩]

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে পত্রিকাটি ছিল সমৃদ্ধ। সম্পাদকীয় কলম থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ রচনাই বলাইচাঁদকে একাই লিখতে হত। তারকদাস মজুমদার এই পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন। তারকদাস মজুমদারের ভাই সুধাংশুশেখর মজুমদার যিনি 'বটুদা' বলে পরিচিত, তিনি ছিলেন পত্রিকাটির গুণমুগ্ধ পাঠক। এই বটুদার উৎসাহে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্তর 'মালঞ্চ' পত্রিকায় বলাইচাঁদের প্রথম কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি দেখে সকলেই বলাইচাঁদের প্রশংসা করলেও স্কুলের সংস্কৃত পন্ডিত রামচন্দ্র ঝা খুশি হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে স্বল্প বয়স থেকে কাব্য চর্চায় মনোনিবেশ বলাইচাঁদের পড়াশুনায় ক্ষতি করতে পারে। তাই তিনি কাব্যচর্চা করতে বলাইচাঁদকে নিরুৎসাহিত করেন। তখন উপায় বের করলেন বটুদা। বটুদার পরামর্শে বলাইচাঁদ বনফুল ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। এ প্রসঙ্গে বলাইচাঁদ তাঁর 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে জানিয়েছেন :

> ''ছেলেবেলায় ভৃত্য মহলে আমার নাম ছিল জংলিবাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোবাসি। বাল্যকালে অনেক কীটপতঙ্গ প্রজাপতির পেছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখী চিনিবার জন্য অনেক জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার

নিকট রহস্য-নিকেতন। এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম।''[৪]

এরপর থেকেই লেখক হিসেবে তাঁর পরিচয় বনফুল নামে। ছদ্মনাম গ্রহণ করে কোচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সম্পাদিত 'পরিচারিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ঊষা' নামে একটি কবিতা (১৩২৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ)। এ পত্রিকাতেই কিছুদিনের মধ্যেই 'দূর্বা' ও 'প্রদীপ' নামে বনফুলের আরও দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বনফুল হাজারিবাগে প্রখ্যাত সেন্ট কলম্বাস কলেজে পড়তে যান। হাজারিবাগে এসে বনফুল বহু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এখানে পড়তে এসেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, অমিয় চক্রবর্তী ও প্রমথ রায়ের সঙ্গে। তারা বোর্ডিং-এ একই ব্লকে থাকতেন। এখানে একদিন শিক্ষক মহাশয় গরু সম্পর্কে রচনা লিখতে দিলে বনফুল কবিতার ভাষায় তা ব্যক্ত করেন :

''মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়,
টানায় তোমায় লাঙ্গল গাড়ী
একটু যদি দোষ করেছ—
অমনি পড়ে লাঠির বাড়ি।
আপন জিনিস বলতে তোমার
নাই ক' কিছুই এ বিশ্বেতে
তোমার বাঁটের দুধ-টুকু তা-ও
বাঁছুর তোমার পায় না খেতে।
মানুষ তোমার মাংস খাবে,
অস্থি দেবে জমির সারে,
চামড়া দিয়ে পরবে জুতো
বারণ কে তায় করতে পারে!
তোমার পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্প-তরু,
কারণ নহ সিংহ কি বাঘ
কারণ তুমি নেহাৎ গরু।''[৫]

—বনফুলের মানবিকতাবোধ সুন্দরভাবে ধরা পরেছে এখানে। বনফুল পরবর্তী সময়ে নৃতত্ব বিষয়ে যে গভীর উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন তার শুরু হয় এখান থেকেই। এখানে ইতিহাসের শিক্ষক

জ্ঞানবাবুর মানবের অতীত বিষয়ে বক্তব্য শুনে বনফুলের মনে হয়েছিল অতীতের এই মানবসমাজ যেন রূপকথার দেশের সমাজ। এই বক্তৃতা শুনে বনফুল নৃ-তত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করতে উৎসাহী হয়ে উঠেন। এই কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের ব্যক্তিত্বও বনফুলকে প্রভাবিত করেছিল। কার সাহেবের শৃঙ্খলাপরায়ণতা, স্নেহপ্রবণতা, পরোপকারিতাবোধ এবং আর্তের জন্য সেবাপরায়ণ মানসিকতায় বনফুল মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বনফুলের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়েছিল। এখানে বনফুলের আরেকটি লাভ হয়েছিল। এখানকার অধ্যাপকদের উৎসাহে ইংরেজি উপন্যাস ও কবিতার সঙ্গে বনফুল পরিচিত হলেন। এই সময় টলষ্টয়ের 'ওয়ার এ্যান্ড পীস', ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, বার্ণস এবং সেক্সপীয়ারের বিভিন্ন রচনা পাঠ করে মুগ্ধ হন তিনি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বনফুল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে যান। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়তে আসা বনফুলের জীবনে আরেকটি নতুন অভিজ্ঞতা। ''মফস্বলের ছেলে বলাইচাঁদের এই প্রথম নগর দর্শন। কেবল নগর দেখা নয়, বাংলা দেশের বৃহৎ নাগরিক জীবনযাত্রা ও তার চরিত্রকে প্রথম জানার সুযোগ হল তাঁর।''[৬]
—কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিজস্ব হোষ্টেল না থাকায় বনফুলকে থাকতে হয়েছিল মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি মেসে, যদিও এরপরে কয়েকবার তিনি বাসস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। কলকাতায় বসবাসের সুবাদে একদিকে বনফুল যেমন নগর জীবনের সান্নিধ্যে এলেন তেমনি আরেকটি লাভ হল তাঁর। কিছুদিন তাঁকে শেওড়াফুলি থেকে ডেইলি-প্যাসেঞ্জারি করতে হয়েছিল। এই ডেইলি প্যাসেঞ্জারির সূত্রে বনফুল লিখেছেন :

> ''আমার বিহারে জন্ম। বাংলা দেশের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। শেওড়াফুলি হইতে কলিকাতায় ডেলি প্যাসেনজারি করিতে করিতে আমার সে পরিচয় হইয়া গেল। নানা রকম বাঙ্গালী দেখিলাম এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী চরিত্রের আভাসও পাইলাম। যাহাদের প্রত্যহ দেখিতাম, তাহারা অধিকাংশই অফিস-গামী কেরানি। ছাত্রও কিছু কিছু থাকিত। কিছু ব্যাবসায়ী, কিছু শিক্ষক প্রত্যহ আমার সঙ্গী হইত। সমস্ত মিলাইয়া মনে সেদিন যে ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাতে নানা রং। স্বার্থপরতার রং, নীচুতার রং, কলহ-প্রবণতার রং, রসিকতার রং, ভাব-প্রবণতার রং, ছ্যাবলামীর রং, অসভ্যতার রং, ভদ্রতার রং—অনেক রংএর বিচিত্র ছবি সেটা।''[৭]

এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। কিন্তু কলকাতায় অবস্থান তাঁকে বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিল। বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার এই সুযোগ বনফুলের অভিজ্ঞতাকে করল আরও সমৃদ্ধ। কোনও সন্দেহ নেই

এই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে বনফুল কথাসাহিত্যের আঙ্গিনায় ফুটিয়েছিলেন রঙবেরঙের ফুল। ইতিমধ্যেই কবি হিসেবে বনফুলের খ্যাতি হয়েছে। এ কবিতাগুলি অধিকাংশই ছিল হাসির কবিতা বা ব্যঙ্গ কবিতা। বিভিন্ন কাগজে এগুলি প্রকাশিত হত। মেডিকেল কলেজে পড়াকালীনই তাঁর 'বিবাহের ব্যাকারণ', 'ছাড়পোকা' ইত্যাদি কবিতাগুলি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়েই 'ফরমাসী প্রিয়া' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন বনফুল যা 'বিজলী'তে (নজরুল ইসলাম সম্পাদিত কাগজ) ছাপা হয়েছিল। কবিতা লিখতে লিখতেই একদিন বনফুল ছোটগল্প রচনায় হাত দিলেন। এ প্রসঙ্গে বনফুল জানিয়েছেন :

> ''মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাস-রুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকান্ড ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসিয়া থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারি না। মেডিকেল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন 'বাড়তি-মাশুল', 'অজান্তে' প্রভৃতি চার পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো? 'প্রবাসী'-তেই সবগুলি গল্প পাঠাইয়া দিলাম।''[৮]

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হল বনফুলের প্রথম গল্প 'চোখ গেল' (আশ্বিন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। এরপর ক্রমশ প্রকাশিত হয় তাঁর 'বাড়তি মাশুল', 'আত্মপর' 'অজান্তে' প্রভৃতি গল্পগুলি।

১৯২৬ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ বনফুলের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য সময়। বনফুল তখন মেডিকেল কলেজে ষষ্ঠ বর্ষের অর্থাৎ ফাইনাল বর্ষের ছাত্র। এই সময় বনফুলকে কিছুদিনের জন্য ব্যাঙ্গালোরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ট্রেনিং এর জন্য যেতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় একজন স্কটিশ নার্সের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়নি। তবে অনেক দিন এই মেয়েটিকে মনে রেখেছিলেন বনফুল। ব্যাঙ্গালোর ত্যাগের সময় তিনি এই মেয়েটিকে নিয়ে একটি ইংরেজী কবিতাও লিখেছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি যখন 'ডানা' উপন্যাস লিখেছেন তখন এই কবিতাটিকে ব্যবহার করেছেন। যাই হোক ২৪ জৈষ্ঠ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ধুমধাম সহকারে লীলাবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লীলাবতী তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী। বিয়ের ঠিক পরে পরেই দুজনের পরীক্ষা থাকায় একসঙ্গে তাঁদের থাকা হয়নি। সে সময় বনফুল নববিবাহিত স্ত্রীকে অনেকগুলি প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে বনফুল 'কষ্টিপাথর' উপন্যাসে কিছুটা পরিমার্জন করে এই প্রেমপত্রগুলিকে প্রকাশ করেন।

ডাক্তারি পাস করার পরেই বনফুল পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়র হাউস সার্জেনের চাকরী পান। কিন্তু সেই চাকরীতে তিনি যোগদান করলেন না। কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন

সেখানে চাকরী করতে গেলে সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী উপরওয়ালাকে দেখা হওয়া মাত্রই সেলাম ঠুকতে হবে। বনফুল চিরকালই ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। এভাবে সেলাম ঠোকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সে চাকরীতে যোগদান করলেন না। সেখানে যোগদান না করে কলকাতায় এসে ক্লিনিকাল প্যাথলজীতে ট্রেনিং নিতে শুরু করেন ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছে। অবশ্য ল্যাবরেটরীতে যোগদান করার পেছনে আর একটি কারণও ছিল। সেটি হল সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ। জেনারেল প্র্যাকটিশের তুলনায় ল্যাবরেটরীতে কাজ করলে সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি অনেক বেশী সময় পাবেন এ ভাবনাও তাঁর কাজ করেছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকরিতে যোগদান করেন। খুব অল্প দিনের মধ্যেই ডাক্তার হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তিনি একবছর ছিলেন। আজিমগঞ্জের আবহাওয়া ভালো না লাগায় কিছুদিন পর ভাগলপুরে প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি নির্মাণ করে স্বাধীনভাবে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ আরম্ভ করলেন।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ বনফুলের সাহিত্যিক জীবন সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। নববিবাহিত স্ত্রী, সাংসারিক নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্মজীবনে বেশী করে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি নানা কারণে বনফুল সাহিত্যচর্চা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাই বলে সাহিত্য চর্চার উৎসাহে তাঁর বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। এই সময় তিনি নব-বিবাহিতা স্ত্রী লীলাবতীকে বহু প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখে উপহার দিয়েছেন যেগুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এগুলি কোনটিই সচেতন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস নয়। এই সময় আকস্মিকভাবেই বন্ধু পরিমল গোস্বামী তাঁর ভাগলপুরেরর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় লেখা দেওয়ার জন্য পরিমল গোস্বামী বনফুলকে অনুরোধ করলে বনফুল তাঁকে 'শনিবারের চিঠি' তে নিয়মিত লেখা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরিমল গোস্বামী তাঁর 'স্মৃতি কথা'য় লিখেছেন :

> ''বলাই অনেকদিন লেখা ছেড়ে দিয়েছে। তাঁর ভিতরকার লেখকটি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। সুদীর্ঘ আট বছর ধরে পড়ে আছে। অতএব এবারে ডাক্তারির পালা আমার। আমি ধীরে ধীরে লেখকটির গুপ্তাবাসে ঢুকে তাঁর হৃদযন্ত্রে ম্যাসেজ করতে আরম্ভ করলাম। যন্ত্র চাঙ্গা হয়ে উঠল।''[৯]

এরপর নতুন উদ্যমে বনফুল সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হল 'ভাদুড়ী' নামে একটি কবিতা। এরপর থেকে 'শনিবারের চিঠি'তে বনফুলের বহু

গল্প কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাত্মক। পরিমল গোস্বামী বনফুলের এ সময়কার লেখা সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> ''অনেকদিন পরে তাঁর নতুন করে লেখা। অনেক লেখায় দুজনের পরামর্শ ছিল, এমনকি যখন সে ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করল, বনফুলের ছোটগল্প অনেক সময় কাগজের আধ পৃষ্ঠা, তখন কয়েকটিতে তাঁর দুর্বলতা ধরা পড়ল। বললাম এ গল্পগুলি ছন্দে লিখলে সহজে জমে উঠবে। ছন্দে লেখা হওয়াতে সত্যই রূপান্তর ঘটল, সুপাঠ্য হল, এবং আশ্চর্য সুন্দর ছোটগল্প হল। সংস্কারের কাজ আমাকেও করতে হয়েছিল কিছুদিন। বলাই-এর যে অসাধারণ কল্পনা ও রচনাশক্তি ছিল, আমি খুলে দিলুম তার ছিপি।''[১০]

বনফুলের সাহিত্য জীবনে পরিমল গোস্বামীর এই অবদান বনফুল নিজেও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন বহুবার। বনফুল তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন :

> ''পরিমল বলিল—'তুমি যদি প্রতিমাসে লিখতে রাজি হও আমি নিশ্চিন্তমনে এ ভার লইতে পারি। তোমাকে ব্যঙ্গ রচনা লিখিতে হইবে। কাগজে মোহিতলাল মজুমদার, নীরদ চৌধুরী নিয়মিত লিখিবেন বলিয়াছেন। আমি তো লিখিবই। তোমাকেও লিখিতে হইবে। পরিমলকে প্রতিশ্রুতি দিলাম লিখিব। আমার মনে ব্যঙ্গ-রসাত্মক অনেক গল্পের প্লট তখন গিজগিজ করিতেছে। তাহাই কবিতায় লিখিতে শুরু করিলাম। প্রথম কবিতা বোধ হয় 'ভাদুড়ী'। তাহার পর প্রতিমাসেই শনিবারের চিঠিতে আমার ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। রসিকদের নিকট বাহবা পাইলাম। পরিমল ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিল। সুতরাং আমার লেখার উৎসাহ স্তিমিত হইল না। পরিমল আমাকে থামিতে দিল না। পরিমলের নিরন্তর তাগাদা না থাকিলে আমি এতগুলি ব্যঙ্গ কবিতা বোধ হয় লিখিতাম না।''[১১]

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ বনফুলের সাহিত্যজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। কারণ এই বছরই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখন্ড' প্রকাশিত হয় রঞ্জন পাবলিসিং হাউস থেকে। এতদিন পর্যন্ত যে ব্যঙ্গ কবিতা ও ছোট গল্প লিখে কবি ও ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন এবারে ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। এ বছরই প্রকাশিত হল তাঁর আরও একটি উপন্যাস 'বৈতরণীর তীরে'। তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'বনফুলের গল্প' এবং কবিতা সংগ্রহ 'বনফুলের কবিতা' গ্রন্থদুটিও এবছরই প্রকাশিত হয়েছিল। এই একই বছরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আশ্বিন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর 'দ্বৈরথ'

উপন্যাসটি। বাঙ্গালী পাঠক সমাজও একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাবে পুলকিত হয়ে উঠলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বাগত জানালেন।

(২)

বনফুলের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিভা কবিতার ক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে না ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এ বিতর্ক চলতেই পারে কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বনফুলের শিল্পীসত্তা সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশেই ব্যঙ্গাত্মক। তা কখনও প্রকাশিত হয়েছে কবিতার আঙ্গিকে আবার কখনও বা ছোটগল্পের আঙ্গিকে। সারা জীবন ধরে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন বনফুল, হয়তো তার সবটাই ব্যঙ্গ কবিতা নয়। কিন্তু একথা ঠিক ব্যঙ্গ কবিতার ক্ষেত্রে বনফুল যে পরিমান সফলতা অর্জন করেছেন অন্য ক্ষেত্রে তা হয়নি। আবার এ কথাও ঠিক যে বনফুলের কবিতাগুলি যতটা কাব্যময় তার থেকে অনেক বেশি আখ্যানধর্মী, এবং বহু ক্ষেত্রেই তা ছোটগল্পের আস্বাদে পরিপূর্ণ, যেমন 'ভাদুড়ী', 'অন্নদা সরকার', 'অবিনাশ' প্রভৃতি কবিতা। সুতরাং বলা যেতেই পারে বনফুলের কবিসত্তা ও ছোটগাল্পিক সত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মাত্র। এখন প্রশ্ন হল বনফুলের হাস্যরসিক সত্তা গড়ে উঠল কীভাবে?

বনফুল শৈশবকাল থেকেই ছিলেন একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। প্রচলিত নিয়ম কানুন, রীতি-নীতিকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ না করার মানসিকতা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। কলকাতার পথে ঘাটে তিনি যখন চলতেন, পথঘাটের প্রচলিত নিয়ম নীতিকে তিনি সবসময় মেনে চলতেন না। বন্ধু পরিমল গোস্বামীর কাছ থেকে জানতে পারি :

''তাঁর নিজের সম্পর্কে কে কী ভাববে বা বলবে তা সে তাঁর অসাধারণ ঔদাসীন্যে অগ্রাহ্য করে চলার এক অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে দিত। এ-বিষয়ে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। এ দিক দিয়ে সে তাঁর গুরু ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত শিষ্য ছিল। পোশাক পরিচ্ছদ ছেঁড়া হোক, গ্রাহ্য নেই। মাটিতে বসে পড়ত যেখানে সেখানে। চুলে চিরুনি পড়ত না আদৌ। ধুলো পায়ে বিছানায় শুয়ে পড়ত। দাড়ি গজাচ্ছে মুখে, ভ্রুক্ষেপ নেই। একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য।''[১২]

শৈশব থেকেই বনফুলের চরিত্রে ব্যঙ্গপ্রবণতা সক্রিয় ছিল এবং তাঁর কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেত। ছাত্র জীবন থেকে কোন রকম ভন্ডামিকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট ভাবে বলতে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাই এক কনের বাবাকে স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলতে পেরেছিলেন :

''বিয়ে করতে চাইলে কনের নাক ক'ইঞ্চি বা চামড়া কেমন, তা কখনও দেখবো না। দেখি তো ব্লাড, স্পিউটাম, ইউরিন রিপোর্ট দেখব। বিয়েতে আমার ন্যূনতম শর্ত থাকবে এই যে, প্রথমত : সে একটি মেয়ে হবে, দ্বিতীয়ত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হবে, এ ভিন্ন চামড়ার রঙে বা নাক মুখের মাপে আমার ইন্টারেষ্ট নেই।''[১৩]

একবার চন্দ্রগ্রহণের সময় ভারতীয় রীতি অনুযায়ী গৃহস্থ বাড়ীগুলি থেকে শঙ্খ ধ্বনি বেজে উঠল। একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক সেই শঙ্খধ্বনি শুনে বিস্মিত হলেন। পাশ দিয়েই হাটছিলেন বনফুল এবং তাঁর বন্ধু শিবদাস। তিনি তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শিবদাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

''Do you know what is happening in the moon? Look up and see.'

'There is shadow on the moon. I think it is eclipse`…

বনফুল তখন গম্ভীরভাবে বললেন :

'You are ignorante, that`s why you are seeing a shadow. It is Rahu who is swallowing the moon as the english power swallows India, but both will go away soon.'' [১৪]

বনফুলের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত খামখেয়ালী ধরণের। এই খামখেয়ালীপনার বহু উদাহরণ তাঁর জীবনে পাওয়া যায়। শুধু ছাত্র জীবন বা শৈশবেই নয় আজীবন তিনি ছিলেন এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বিবর্ধিত একটি চরিত্র। বন্ধু পরিমল গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচিত্রন করতে গিয়ে এরকম বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এমনকি বনফুল নিজেও তাঁর 'পশ্চাৎপট` গ্রন্থে এরকম বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অপরিচিতের বাড়িতে ঢুকে অসুস্থ বন্ধুর জন্য ভাত ডাল ভিক্ষে করে আনা, বন্ধুর বিয়েতে দেশী বেঙ্গল কেমিকেলের 'কডলিভার তৈল' উপহার দেওয়া, বন্ধুর শ্বশুর বাড়িতে চিঠি লিখে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা, ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে নিজে গন্তব্যস্থল ঠিক না করে বুকিং ক্লার্কের কাছেই গন্তব্যস্থল ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া, ময়দানে গিয়ে রাত বাড়োটার সময় তিন ঘন্টা ধরে বন্ধুর চিঠির বান্ডিল পড়ে বাকি রাতটুকু হাওড়া স্টেশনে কাটিয়ে আসা, রাস্তায় অপরিচিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন বলাইচাঁদের স্বভাবের খামখেয়ালী প্রকৃতিকেই তুলে ধরে। আর এ সবের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটাই তা হল মুক্ত আনন্দ লাভ। এই মুক্ত আনন্দ লাভ করার প্রবণতা ছিল তাঁর এতটাই যে এ ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ভাবনা তাঁর মাথাতেই

থাকতো না। এর ফলে মাঝে মঝে তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তেন। এ নিয়ে অবশ্য তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল না। এর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেতেন অপরিসীম আনন্দ।

এ প্রসঙ্গগুলি অবতারণা করার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে একটা অস্বাভাবিক অসঙ্গতি বনফুলের চরিত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে যা বনফুলের শিল্পীসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে আজীবন। এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে পর্যবেক্ষন করেছেন তিনি মানুষের বিচিত্র চরিত্রকে এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গগুলিকে যা বহু ক্ষেত্রেই জন্ম দিয়েছে হাস্যরসের।

বনফুলের ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর বাবা মায়ের যে একটি বড় ভূমিকা ছিল এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। পিতামাতা ছাড়াও তিনি এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন বনফুলের ব্যক্তিত্ব গঠনে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এই তালিকায় প্রথমেই নাম করতে হয় ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যিনি অনেকটাই ছিলেন বনফুলের friend philosopher and guide-এর মত। তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। পরিমল গোস্বামী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

> ''তৎকালে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত চরিত্রের ব্যঙ্গকার ছিলেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সর্বজাতীয় গোঁড়ামীর প্রতিই ছিল তাঁর বিদ্রোহ।....দুর্লভ পুরুষোচিত সৌন্দর্য ছিল তাঁর চেহারায়, বাক্যে, ব্যাবহারে....তাঁর লক্ষ্য সবসময়েই প্রথা বা সমাজের নামে অসহায় মেয়েদের উপর অত্যাচারী পুরুষের বিরুদ্ধে। সত্য কথা বলতে তাঁর কোথাও কোন দ্বিধার লেশমাত্র ছিল না।''[১৫]

শুধু তাই নয় তিনি তাঁকে স্যাটায়ারের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন।

বনবিহারীবাবু তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সমাজের নানা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপবানে জর্জরিত করেছেন। 'নরকের কীট' ও 'দশচক্র' প্রভৃতি গ্রন্থে পুরুষদের নারী নির্যাতনকারী মানসিকতার প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করেছেন। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ছাত্রজীবনে এরকম একটি ব্যক্তির সংস্পর্শ লাভ বনফুলকে ব্যঙ্গাত্মক রচনার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বনবিহারীবাবুর চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য বনফুল আয়ত্ত করেছিলেন। বনফুল নিজেই জানিয়েছেন :

> ''ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনার দিকে আমার প্রবণতা অনেকদিন হইতেই ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনা হইতেই আমি বোধহয় প্রথম প্রেরণা পাই। তাহার পর বনবিহারীবাবু আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।''[১৬]

শুধু সাহিত্যিক প্রেরণাই নয় বনবিহারীবাবু ছিলেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান গুরু। বনফুল নিজেই বলেছেন :

''মেডিকেল কলেজে তাঁহার নিকট আমি পড়িয়াছি। কিন্তু, তিনি আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। লেখার জন্যই আমাকে স্নেহ করতেন তিনি। কিছু প্রশ্রয়ও দিতেন। সে সাহসে আমি ভাগলপুরে থাকিতে আমার অনেক লেখা তাঁহাকে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতাম পড়িবার জন্য। স্কুলে মাস্টারমহাশয়েরা পূর্বে যেমন ছেলেদের Exercise-book সংশোধন করিয়া দিতেন, তেমনি তিনি আমারও অনেক লেখা সংশোধন করিয়া পাঠাইতেন। সঙ্গে দীর্ঘ চিঠিও থাকিত। চিঠি নয়, যেন বেত। সাহিত্যের প্রকৃত সমজদার ছিলেন তিনি। অত্যন্ত কড়া সমালোচক, কোন রকম শৈথিল্য সহ্য করিতেন না। আমার সাহিত্য-সাধনার পথে তিনি প্রথম শ্রেণীর 'গাইড' ছিলেন একজন।''[১৭]

বনফুল তাই এ চরিত্রটিকে ভুলতে পারেননি কোন দিন। সুকুমার সেন বনফুলের উপর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন :

'' বনবিহারীর সম্পর্কে বনফুল এসেছিলেন জুনিয়ার শিক্ষকের কাছে সিনিয়ার ছাত্ররূপে। মনে হয় পিতার পরেই বনবিহারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল বলাইচাঁদের চরিত্র গঠনে। পিতার উদারতা আর শিক্ষকের দৃঢ়তা বনফুলের রচনার বয়নে টানাপোড়েন গেঁথে আছে। একাধিক উপন্যস্ত কাহিনীর চরিত্রে বনবিহারীর প্রতিফলন হয়েছে।''[১৮]

বনবিহারীর চরিত্র অনুসারে তিনি পরবর্তী কালে সৃষ্টি করেছেন 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসে তাঁর বিখ্যাত চরিত্র অগ্নীশ্বর।

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যঙ্গরসাত্মক শিল্পী পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে ছাত্রাবস্থা থেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন বনফুল। সাহেবগঞ্জে স্কুলে পড়াকালীন তার সঙ্গে বনফুলের আলাপ হলেও অন্তরঙ্গতা হয় তিন নম্বর মির্জাপুরে স্ট্রীটে থাকাকালীন। পরিমল গোস্বামীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব আজীবন বনফুলের মধ্যে কাজ করেছিল। পরিমল গোস্বামীর অনুপ্রেরণাতেই বনফুল হাস্যরসাত্মক রচনার দিকে একটা সময় পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে ছিলেন। পরিমল গোস্বামী ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক হন। পরিমল গোস্বামীর প্রভাবেই বনফুল 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। বলাই বাহুল্য 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই ব্যঙ্গরসাত্মক। কেননা ব্যঙ্গধর্মী রচনা ছাড়া অন্য কোন লেখা 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করতে চাইত না।

বনফুলের জীবনে আরেক পরম প্রাপ্তি সজনীকান্ত দাস। তিনি ছিলেন বনফুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মেডিকেল কলেজে পড়াকালীনই বনফুলের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর যিনি পরবর্তীকালে

বনফুলের সাহিত্য জীবনে অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস ছিলেন 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক। ব্যঙ্গ রচনায় সজনীকান্ত দাসের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। তাঁর লেখার মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণগুলি এমন শাণিত ও মর্মভেদী হয়ে উঠেছে যে সেগুলি উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

> ''রবীন্দ্রকাব্যের ভাবতরল প্রভাবে এককালে দেশের যুবকদের মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল, দুর্বল, কর্মবিমুখ ও উদ্ভট কল্পনাচারী তরুণদের মধ্যে যে স্বপ্নবিলোল প্রণয় মাদকতা অত্যন্ত সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের প্রতিই সজনীকান্তের বিদ্রূপবানগুলি প্রধানত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রণয়পাগল যুবকদের প্রণয় সাধনার নানা গুহ্য উপায় ও দুর্নিবার অধ্যবসায়ের কথা লেখক নিঃসঙ্কোচে বাস্তব নিষ্ঠার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, লেখকের আঘাতগুলি মনের মধ্যে যতই জ্বালা ও গ্লানির উদ্রেক করুক না কেন উহাদের প্রবল হাস্যজনকতা এবং সরস উপভোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না।''[১৯]

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে তাঁর রচিত প্যরডিগুলি, নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি কবির প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপগুলি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কোনও সন্দেহ নেই সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বনফুলকে ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সজনীকান্তের অনুরোধেই 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় বনফুল 'আধুনিক গল্পসাহিত্যে করুণ রস' নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রবন্ধটি ছাড়াও 'কাঁচি' নামক একটি কবিতা বনফুল সঙ্গে দিয়েছিলেন যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠিতে'ই। এভাবেই 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয় বনফুলের যা বনফুলের ব্যঙ্গাত্মক রচনার দ্বার খুলে দেয়।

বনফুলের আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন শিবদাস। শিবদাস বসু মল্লিক তাঁর মেডিকেল কলেজ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বনফুল তাঁর সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> ''তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, কথাবার্তার মধ্যে তাঁহার নিজের সৃষ্ট অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দাবলী, তাহার হিউমার আমাকে বড়ই মুগ্ধ করিত। এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে কিছুদিন মেস পরিত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীতে পেইং-গেষ্ট হিসাবে বাস করিয়াছিলাম। ফলে তাহার পরিবারের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। ঘনিষ্ঠতা না বলিয়া আত্মীয়তা বলাই উচিত। ভন্টুর বাবা, দাদা, মেজদা, ছোট ভাই, ভন্টুর বউদিদিরা, বিশেষ করিয়া বড় বউদি, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার পরম আত্মীয় হইয়া গেল। ইহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমি অনেকদিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত

ছিলাম। এই সবের ছাপ আমার পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাস 'জঙ্গম' বইটিতে আছে।''[২০]

একটি সাইকেলে চড়ে যত্র তত্র ঘুড়ে বেড়ানো ছিল শিবদাসের নেশা। যখন তখন যাকে তাকে প্রণাম করে বসার অদ্ভুত খেয়াল ছিল তাঁর। বন্ধু পরিমল গোস্বামী তাঁর সম্পর্কে জানিয়েছেন :

''তাঁর চরিত্রও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি এ রকম একটি চরিত্র কল্পনাই করতে পারিনি। তাঁকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন হাসিমুখে লড়াই করতে আর আমি দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি।

শিবদাস সামান্য স্থূলকায় ছিল। মুখখানা গোলগাল, শার্টের উপর বুকখোলা কোট, ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, মুখে একটু বিষন্নতার ছাপ, হাসলে সে হাসি শিশুর মতো সরল এবং সুন্দর, হয় তো বা একটুখানি বিষন্নতার ছোঁয়াচ তাতে ছিল বলেই তা এমন সুন্দর। এমনি চরিত্র অথচ মধুর ব্যঙ্গপ্রিয় এবং দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভরা। প্রায় সব সময় সে সাইকেলে চড়ে বেড়াত। সে কারো কাছে সামান্য উপকার পেলে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করতো। উপকারের সম্ভাবনাতেও পায়ের ধূলো মাথায় মাখা তাঁর ছিল রীতি। এ বিষয়ে বয়স জাতি বা শ্রেণীভেদ তাঁর কাছে ছিল না। ঝাড়ুদারের পায়ের ধূলো নিয়েছে সে অবলীলাক্রমে। কেউ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে, কেউ চমকে উঠেছে, কেউ সন্দেহ করেছে, কিন্তু প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে শিবদাস যখন সরল হাসিটি হেসে বলত, ''আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, আপনার পায়ের ধূলো আমাকে নিতেই হবে, জ্যেষ্ট কি না বলুন'—'তখনই সন্দেহকারীর সকল সন্দেহ দূর হয়ে যেত, তখন সে পুনরায় তার পায়ের ধূলো নিত।''[২১]

বলা বাহুল্য এই কৌতুকপ্রিয়, সদারসিক বন্ধুটির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বনফুলের কৌতুক প্রবণতা বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

(৩)

বনফুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'চোখ গেল'। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৯ সালে আশ্বিন সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। এর পর একে একে ৫৭৮টি গল্প মোট ৩৫টি গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। বনফুলের গল্পের সংখ্যার মতই তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্যও অনেক, যেমন—চরিত্রপ্রধান গল্প, মনস্তত্ত্বমূলক গল্প, ডাক্তারী অভিজ্ঞতাপ্রধান গল্প, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসপ্রধান

গল্প, সমাজ-সমস্যামূলক গল্প, পশুপ্রীতিমূলক গল্প, রূপক ও প্রতীকধর্মী গল্প, শিশুচরিত্র বিষয়ক গল্প। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র শুধুমাত্র বনফুলের ব্যঙ্গ ও হাস্যরস প্রধান গল্প নিয়ে।

একজন ছোটগল্পকার তাঁর জীবনের বহু খন্ড খন্ড অভিজ্ঞতাকে রূপ দেন ছোটগল্পে। আর এই অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে ওঠে যে সকল সূত্রের নিরিখে তার মধ্যে কর্মজীবন একটি। তাই শিল্পীর কর্মজীবন এবং সেই সূত্রে প্রাপ্ত নানা অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীজীবনে অনিবার্যভাবেই এসে ভীড় করে। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু এরা প্রায় সকলেই সাহিত্য জগতে যে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও লোকচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রেই। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও এ কথা সর্বাংশে সত্যি। পেশাতে তিনি ছিলেন চিকিৎসক আর এই চিকিৎসা সূত্রেই তাঁর যে বহু বিচিত্র একটি অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিকভাবে বিরাট সংখ্যক ছোটগল্পের লেখক বনফুল ছোটগল্প লেখার সময় সেখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন বিষয়ের ছোটগল্পের জগৎ গড়ে উঠেছে। সেটি হল ডাক্তারী অভিজ্ঞতা প্রধান গল্প। 'বনফুলের গল্প সংগ্রহের' ভূমিকায় সুকুমার সেন একে বলেছেন 'ডাক্তারী রস'। বনফুলের বহু ছোটগল্পে এই ডাক্তারী অভিজ্ঞতার নিদর্শন রয়েছে। এরকমই একটি গল্প **'নাথুনির মা'**। গল্পটি ডাক্তারী-অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং ডাক্তারী-রস প্রধান হলেও এর মূল রস কিন্তু হাস্যরস। মুখরা শাশুড়ি তার পুত্রবধূকে গালাগালি দিতে গিয়ে যেমনি পোড়ারমুখী বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই পোড়ার পর্যন্ত বলেই বুড়ির 'লক্ জ' হয়ে গেল। 'লক্ জ' হলে মুখ কিছুতেই বোজে না, হা করেই থাকতে হয় যতক্ষণ না কোনও ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসিয়ে দেন। যাইহোক পুত্রবধূ তার শাশুড়ীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে হাজীর হল। ডাক্তারবাবু চোয়ালটি ঠিক করে দিতেই বুড়ি তার অসমাপ্ত শব্দটি শেষ করল 'মুখী' বলে।

এ গল্পের হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে রোগের বিচিত্র ধরণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ হাসিও একেবারে উদ্দেশ্য বর্জিত নয়। গল্পপাঠক গল্প পরে প্রথমে হাসে, কিন্তু হাসি থামতেই পাঠক যখন ভাবতে বসে তখন সেই উদ্দেশ্য আর গোপন থাকে না। শাশুড়ী পুত্রবধূর মধ্যে যে চিরন্তন কলহ কথাকাটাকাটি চলে এবং নিজেকে অপরের কাছে নির্দোষ প্রমানিত করবার জন্য প্রয়োজনে কলহের সময় ব্যবহৃত কথাবার্তাগুলিকে অস্বীকার করবার প্রবনতাকে বনফুল এ গল্পে তুলে ধরেছেন। কিন্তু নাথুনির মায়ের দুর্ভাগ্য ডাক্তারের সামনে তার মুখ থেকে পোড়ার পরের অংশ 'মুখী' বেড়িয়ে পড়েছে। 'লক্ জ' না হলে যা হয়তো কোন তৃতীয় ব্যক্তি তা জানতেও পারতেন না।

বনফুল নিজে ছিলেন চিকিৎসক আর সে সুবাদে চিকিৎসা ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিকর দিকগুলি সম্পর্কে তিনি ভালো মতই অবহিত ছিলেন। তাই চিকিৎসা বিষয়ক নানা অসঙ্গতিগুলি অনায়াসেই স্থান লাভ করেছে তাঁর গল্পে। যেমন **'চেহারা বদল'** গল্পটি। চিকিৎসা সম্পর্কে ভারতবাসীর সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা ও অজ্ঞতাবোধকে তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে। আর তা করতে গিয়ে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে গল্পটিতে যা গল্পটিকে একটি সরস গল্প করে তুলেছে। গল্পকার প্রথমেই জানিয়েছেন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এ দেশের মানুষের কবিরাজী ওঝার চিকিৎসার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কথা। এই বিশ্বাস এদের মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যাবস্থা সম্পর্কে না এরা জানে কিছু, না আছে কোন আস্থা। এই অবস্থায় এক জমিদার পুত্র নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনজন কবিরাজের রোগ নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে জেনেও তাদেরকে সন্তুষ্ট করে কীভাবে তাকে চিকিৎসা করতে হয়েছিল তার সরস বর্ণনা করেছেন গল্পকার। একবার একটা লোককে এক শিশি ওষুধ দিয়ে তিন ঘন্টা অন্তর এক দাগ করে খাওয়ানোর কথা বলে পরে গিয়ে দেখলেন ওষুধ এক ফোটাও খাওয়ানো হয়নি, তার বদলে শিশিতে কাগজের যে দাগ কাটা ছিল, সেগুলো জলে ভিজিয়ে তুলে কেটে কেটে খাওয়ানো হয়েছে। একবার একটি রোগীকে ফল কাটার পরামর্শ দিয়ে পরে শুনলেন সে তাল খেয়েছে। বার্লি খাওয়াতে বলে এসেছেন একজনকে, ক্রমাগত বালি খাইয়েছে। এরকম ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে এ গল্পে তার একমাত্র উদ্দেশ্য সমাজ মানসের বাস্তব অবস্থার প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত করা।

বনফুলের কিছু কিছু গল্প রয়েছে যেগুলিতে রয়েছে হাল্কা চালের হাস্যরস। এ হাসি আমাদের গভীর ভাবের জগতে নিয়ে যায় না। সমসাময়িক পাঠককে কিছুটা আনন্দ দিয়ে এ হাসি আবার মিলিয়ে যায়। বনফুলের এরকম একটি গল্প **'হনুমান সিং'**। এ গল্পে একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে হাসির সৃষ্টি হয়েছে। হনুমান সিং ডাক্তারের কাছে শুনলেন যে তার পুত্রের হুক ওয়ার্ম হয়েছে। হনুমান সিং এর অর্থ বুঝতে না পেরে যে কান্ড করলেন তা হাস্যরসের আমদানির পক্ষে যথেষ্ট :

> ''সিংজি গর্জন করিতেছিলেন,
>
> হুককা পিকর বেমারি বানিয়ে হে, শালা। মানা করতে করতে হয়রাণ হো গিয়া। কেতনা দফে তুমকো কহা না—আরে শালা, হুক্কা মৎ পিও। ডাক্টার সাহেব যন্তর দেকে পকড় লিহিন হুক্কা বেমাড়ি হুয়া হ্যায়, ওর ভি চালাকি?'' উল্ল কাঁহিকা—''[২২]

বনফুল এ ধরনের স্নিগ্ধকৌতুকের গল্প আরো লিখেছেন যে গল্পগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের অভিজ্ঞতার যথাযথভাবে শৈল্পিক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পাঠকের অন্তরে স্নিগ্ধ কৌতুক সৃষ্টি করা।

বনফুলের গল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য সমাপ্তিতে চমক যা বহু ক্ষেত্রে হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। বস্তুত কিছু গল্পে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য প্রধানভাবে দায়ী চমকযুক্ত সমাপ্তি, যেমন **'ঋণ শোধ'** গল্পটি। গল্পটি পাঠ করতে করতে সমাপ্তিতে না আসা পর্যন্ত একজন ঠকবাজের আখ্যান বলে মনে হতে পারে গল্পটিকে। পাঠকের কাছে শেষ বক্তব্যটি আড়াল করতে গল্পকার অদ্ভুত কৌশলে গল্পটি শুরু করেছেন :

> '' ছকুর কাছে এসেছিলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই ছকু বুঝতে পারল কেন এসেছি। প্রায়ই আমাকে আসতে হয় এবং একই উদ্দেশ্যে আসতে হয়। ছকুর কাছে কিছু টাকা পাব। কিন্তু কিছুতেই সেটা পাচ্ছি না।''[২৩]

—আসলে ছকু একজন বি.এ ফেল করা বিবাহিত বেকার যুবক। নানারকম চেষ্টা করে ছকু যখন কিছুই যোগার করতে পারছিল না তখন গল্পকথক তাকে একটি ঘড়ির দোকান করার পরামর্শ দেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাপিটেল তাকে ধার দেওয়ার কথা বলেন। ছকু বছর খানেক কলকাতায় থেকে ঘড়ির কাজকর্ম শিখে এসে গল্প কথকের থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়ে যথারীতি একটি ঘড়ির দোকান খুলে বসে। এর পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়। ছকুর চাল চলন দেখে রোজগারও ভালোই করছে বলে মনে হয়। অথচ গল্পকথককে সে একটিও টাকাও শোধ করেনি। গল্পকথকের কথায় : ''আমি কিন্তু প্রায়ই যাই সন্ধ্যার পর। বসি খানিকক্ষণ। আশা করে থাকি ছকু নিজেই হয়তো কথাটা তুলবে, কিন্তু তোলে না।'' প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছকুর দোকানে গিয়ে ছকুর ব্যবসানীতি এবং ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে তার দৃঢ় ধারণা হয় যে টাকা আর সে ফেরত পাবে না। কিন্তু গল্পের শেষে কথক জানান—

> ''ছকু কিন্তু আমার ঋণ শোধ করেছিল, যদিও একটু তির্যক পথে। একদিন ছকুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বাদল স্যকরা বসে আছে। প্রশ্ন করলাম—এখানে কেন? সে বলল, ছকুবাবুর স্ত্রীর জন্য একটি হার গড়িয়ে এনেছি। হারটি সে দেখাল আমাকে। বেশ ভালো হার।
>
> ''দাম কত পড়ল?''
>
> ''পাঁচশ টাকা''—
>
> ''টাকাটা পেয়ে গেছ তো?''
>
> ''আজ্ঞে হ্যাঁ—''[২৪]

কথঞ্চিত সান্ত্বনা লাভ করলাম। আমি না পেলে আমার মেয়ে তো পেল পাঁচশ টাকা। গল্পের রসহানি হবে বলে আগে বলিনি—ছকু আমার জামাই।''

ছকু গল্পকথকের জামাই এ কথা জানার পরে মনে পড়ে যায় শ্বশুরের সঙ্গে তার বিখ্যাত কথোপকথনগুলি। কলকাতা থেকে ঘড়ি সাড়ানো বিদ্যে শিখে আসার পর শ্বশুরমশাই তাকে ক্যাপিটেল হিসেবে দুশো টাকা দিতে চাইলে ছকু বলে : ''বিড়ির দোকান নয়, ঘড়ির দোকান! অন্তত হাজার খানেক টাকা ক্যাপিটেল না পেলে আরম্ভই করা যাবে না যে। পরে আরও লাগবে। এই দেখুন না লিষ্ট—।''[২৫] শ্বশুরমশাই তাকে অবশেষে পাঁচশ টাকা দিতে রাজী হয়। এবং এর বেশী দিতে পারবে না জানালে ছকু প্রচন্ড রেগে গিয়ে বলে :
''আপনি শেষে এমন ভাবে বিট্রে করবেন জানলে আমি সাউথ আফ্রিকায় সেই চাকরীটা নিয়েই চলে যেতাম।''[২৬] লেখক অবশ্য জানিয়ে দেন যে সাউথ আফ্রিকায় কোন চাকরী সে পায়নি, খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিল মাত্র।

এ গল্পে হাস্যরসের আড়ালে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর চরিত্রকে পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। নিষ্কর্মা জামাইদের শ্বশুরের উপর নির্ভরশীলতা, শ্বশুরের সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা যে একদল শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করেছিল তার দিকেও অঙ্গুলি দির্দেশ করেছেন গল্পকার।

পাওনাদার ও ঋণগ্রহীতার লুকোচুরি খেলা নিয়ে বহু সাহিত্যিক বহু কাহিনি রচনা করেছেন। বনফুল তার **'মাত্র দশটি টাকা'** গল্পে এরকম একটি কাহিনি নির্মাণের মধ্য দিয়ে হাস্যকৌতুকের অবতারণা করেছেন। নিখিলবাবু বিধুবাবুর কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে তাকে বারবার ঘোরাচ্ছেন। একদিন নিখিলবাবু বাড়িতে বসে মাসের খরচের হিসেব করছিলেন। এমন সময় বিধুবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিখিলনাথ তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির চোর কুঠুরিতে আশ্রয় নিলেন। বিধুবাবুকে যথারীতি ঘুরে চলে যেতে হল। বিধুবাবু চলে যেতে না যেতে বিধুবাবু চোর কুঠুরি থেকে বেড়িয়ে এলেন। চোর কুঠুরিতে একটি বোলতার চাক ছিল। কামড়ের চোটে দিগ্বিদিক্‌শূন্য হয়ে পড়লেন নিখিলনাথ। দেখতে দেখতে বাঁ চোখটা ফুলে চোখ ঢেকে গেল। ঠিক এমনি সময় দুজন লোক ধরাধরি করে বিধুবাবুকে নিখিলনাথের বাড়িতে এনে হাজির। নিখিলনাথের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা যায় কীভাবে তা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে হাটার সময় কলার খোসায় পিছলে গিয়ে সাংঘাতিক রকমের আহত হয়েছেন তিনি। তাঁর বাড়ি অনেক দূরে হওয়ায় কাছাকাছি পরিচিত নিখিলনাথের বাড়িতেই তিনি ফিরে এলেন। উভয়ে উভয়কে দেখে বলে উঠলেন—''বাঁচান আমাকে''।

এ গল্পে হাস্যরসের মূল উপাদান প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিধুবাবুর কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিখিলনাথের প্রতারক সুলভ কথাবার্তার মধ্যে। তিন তিনবার ঘোরানোর পরে নিখিলবাবু বিধুবাবুকে জানায় :

''না, ব্যস্ত হবার কথা বইকি! এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ঘোরালাম। আজ আপনাকে ঠিক দিতাম, কাল রাত্রে টাকাটা এনেও রেখেছিলাম। কিন্তু সকালে বোস জা মশাই এসে নাছোড় হয়ে পড়লেন। বেনারসে তাঁর ছেলের অসুখ করেছে, তার এসেছে —কিছু টাকা না হলে—''।[২৭]

—এ কথা যে ডাহা মিথ্যে কথা গল্প পাঠের পর তা আর বুঝতে অসুবিধা হয় না পাঠকদের।

'দর্জি' গল্পের শেষেও এই ধরণের একটি চমক রয়েছে। কলেজ ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ট্রাইকলার ফ্লাগ তৈরী করাতে গিয়ে নির্মল দেখল শহরের সমস্ত দর্জি ব্যস্ত। শিশিরদা জানালো:

''আমার কিন্তু ভাই অবসর নেই । চারটে দর্জি লাগিয়েছি, তবু কুল পাচ্ছি না—''

''আমার কিন্তু চাই-ই । বলেন তো বেশি চার্জ দেব।''

''ডবল দিতে হবে ।''

''বেশ''

নির্মল তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি কাজ করিতে হইবে—উপায় নাই।

মহাত্মা গান্ধী কাল এই ষ্টেশন দিয়া 'পাস' করিবেন। শহর সুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে যাইবে।''[২৮ক]

দুবছর পর আবার এরকমই একটি দিন উপস্থিত হয়েছে। আবার নির্মলের কলেজ ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ফ্লাগ প্রয়োজন। আবার শহরের সমস্ত দর্জি ব্যাস্ত। আবার শিশিরদা ডবল মজুরি চাইল, এবং নির্মলও দিতে রাজী হল।

''ঘটনাও পূর্ববৎ—মহাত্মা গান্ধী কাল এই ষ্টেশন দিয়া 'পাস' করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া ষ্টেশনে হাজির থাকিবে। সবই এক, সামান্য একটু তফাৎ আছে। এবারে ত্রিবর্ণ পতাকা নয়, কৃষ্ণবর্ণ পতাকা।''[২৮খ]

'বেচুলাল' গল্পে দেখি বেচুলাল অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ লোক। সারাজীবন ধরে অজীর্ণ রোগে ভুগছেন তিনি। অথচ সাবধানতারও অন্ত নেই। যে যা বলে তাই করে। অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজী,

হাকিমি টোটকা কিছুই বাদ রাখেননি তিনি। কিন্তু রোগের উপশম কিছুতেই হয় না। তবু চেষ্টার শেষ নেই তার। পরামর্শদাতারও অভাব নেই। এমন সময় তার একজন বাল্যবন্ধু তাকে পরামর্শ দেয় বিশুদ্ধ জল পান করতে। বেচুলাল তাই ত্রিশ বোতল ডিষ্টিল ওয়াটার কিনে নেন। তিন দিন অন্য কোন প্রকার জল স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না তিনি। শৌচাদি কর্ম সারলেন বিশুদ্ধ জল দিয়ে। রোগের কিন্তু উপশম নেই। ঘড়ি ধরে চারটের সময় 'ঘেউ' করে চোঁয়া ঢেঁকুরটি ঠিক উঠতে লাগলো। এর পর সে শুনল সাধারণ ডাক্তারখানায় যে সব ডিস্টিল্ড ওয়াটার থাকে তাও বিশুদ্ধ জল নয় কেননা সেগুলো যে সস্তা বোতলে থাকে তা ঠিক এ্যালকলি ফ্রি নয়। কিছুদিন পরে জলেও এ্যালক্যালি এসে ঢোকে। তাই ডিসটিল্ড ওয়াটার বাদ পড়ে গেল। বিশুদ্ধ জল জোগার করার চেষ্টায় ত্রুটি নেই তার। অবশেষে বেচুলাল খবর পেলে যে রাসায়নিক গবেষনাগার ছাড়া বিশুদ্ধ জল অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। অনেক খরচ পত্র করে কলকাতায় এসে হাজির হল সে। রাসায়নিক গবেষণাগার থেকে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষণাগারের বিচিত্র কর্মকান্ড দেখে অস্থির হয়ে উঠল সে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের ও আগুনের স্পর্শে প্রচন্ড শব্দে শিশির মধ্যে বিন্দুবিন্দু জল উৎপন্ন হল। কিন্তু বেচুলালের সে জল আর দেখা হল না। প্রচন্ড শব্দে তার হার্ট ফেল করল। বাস্তবতাবোধহীন বেচুলালের এই করুণ পরিণতি পাঠকের হৃদয়ে স্মিত হাস্যরস জাগিয়ে তোলে।

'বৈষ্ণব-শাক্ত' গল্পটি পরিহাস রসের গল্প হিসেবে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে গল্প জুড়েছেন দুই সহযাত্রী—কালীকিঙ্কর বর্মা ও নিত্যানন্দ গোস্বামী। তারা দুজন দুই মতে বিশ্বাসী। কালীকিঙ্কর পরম শাক্ত আর নিত্যান্দ পরম বৈষ্ণব এবং তাদের সাজসজ্জাও সেই মত। দুজনেই নিজেদের বিশ্বাসের জায়গায় অনড়। তবে একটা জায়গায় তারা সহমত পোষণ করলেন যে ''অর্থ না থাকলে ধর্ম-টর্ম কিছু টেঁকে না-''। যাইহোক পরের ষ্টেশন আসতেই নেমে গেলেন গোস্বামী মহাশয়। এরপরই গল্পের রহস্য ভেদ করলেন লেখক :

> ''সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শসা খাইয়া নামিয়া গেলেন, তখন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে, গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র—অপর কেহ নন।''[২৯]

দুই ছদ্মবেশধারীর এমন অভিনয়ে পাঠক যথেষ্ট কৌতুক বোধ করে। পাঠকের মনে পড়ে যায় নিত্যানন্দ গোস্বামীর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে স্বীকারোক্তি :

''যাই বলুন আপনি, ধর্মসাধনের প্রশস্ত পথই হল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা একটা পৈশাচিক কান্ড। মানুষেও পারে না—পারা উচিতও নয়—''[৩০]

অথবা,

''... ছেলেবেলায় পাঁঠা কাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।—''।[৩১]

প্রকৃতপক্ষে তিনি যে একজন দুর্ধর্ষ খুনী বজ্রধর মিশ্র একথা জেনে পাঠকের হৃদয়ে স্মিত হাসির রেখা দেয়।

'চতুরীলাল' গল্পে পাঠকের মনে তৈরী হওয়া কৌতুক হঠাৎই দুঃখের মেঘে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চতুরীলাল এমনিতে কৃপণ। তিনি এতটাই কৃপণ যে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে ডাক্তারের ফি নেওয়া নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাকে দরদাম করতে হয়। পয়সার অভাব না থাকলেও ডাক্তারকে তার পুরো ফিস দেয় না সে। চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার কৃপণতা দেখে পাঠক সত্যি না হেসে পারে না। কিন্তু হঠাৎই চতুরীলালের ব্যবহার পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করে। পাঠক সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে চতুরীলাল পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে না পারা সিফিলিসে আক্রান্ত এক অচেনা মহিলার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুকে পঞ্চাশ টাকা খরচ মিটিয়ে দেয়। ডাক্তারবাবুও অবাক হয়ে যায়। চতুরীলাল জানায় :

''ব্যাপারটা কিছুই নয়। ওর মুখটা আমার মায়ের মুখের মতো অনেকটা-''

তাহারপর গলা-খাঁকারি দিয়া বলিল :

'' বাবা মারা যাবার মাস খানেক পরে মাও মারা যান। তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ, মায়ের কোনও চিকিৎসা করাতে পারিনি।-''[৩২]

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চতুরীলালের দুইচোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কৃপণ চতুরীলালের মনের অন্দরে এই স্নেহের ও সহৃদয়তার আভাস পেয়ে পাঠকের চোখও অশ্রু টলমল হয়ে ওঠে।

বনফুল যে কটি নির্ভেজাল কৌতুকরসের গল্প লিখেছেন তার মধ্যে **'জগমোহন'** গল্পটি উল্লেখযোগ্য। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র জগমোহন। নিজের গ্রামের প্রতি তার অসাধারণ প্রীতি। জগমোহনের গ্রাম-প্রীতি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন :

''তাহার গ্রাম-প্রীতি এতই প্রবল যে, গ্রামের মাইনর স্কুলটা হাই ইস্কুল হইল না বলিয়া সে মাইনর পর্যন্ত পড়িয়াই পড়াশুনা খতম করিয়া দিল। তারই লেখালেখি ও চেষ্টায় গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাটি হইয়াছে। সে চাঁদা সাধিয়া না বেড়াইলে বারোয়ারী মন্ডপটা হইত কিনা সন্দেহ। গ্রামের সমস্ত বিবাহে জগমোহন বাঁধা বরযাত্রী। সে যাইবেই এবং কন্যাপক্ষের বাড়িতে গিয়া গ্রাম-মহিমা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-জিহ্বা হইয়া থাকিবে। এ লইয়া বহুবার বহুস্থানে সে হাতাহাতি করিয়াছে।''[৩৩ক]

নিজের গ্রাম নিয়ে কেউ তির্যক মন্তব্য করলে কোন না কোনভাবে সে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। ছলে বলে কৌশলে জগমোহন তাকে বিপর্যস্ত করেই ছাড়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের সম্মান জড়িয়ে আছে যে নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সেই নাটকের অভিনয় কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেই মেনে নিতে পারে না। জগমোহন খবর পায় নাটকে যে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে সে বিপিন গোঁফ কামাতে রাজী নয়। আর গোঁফ না কামালে তো সীতার ভূমিকায় অভিনয় অসম্ভব। নাটকের অভিনয় না হলে সে তো গ্রামের পক্ষে চরম অসম্মানের। এই অসম্মান মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আবার কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় তাকে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। গল্পকথক জানিয়েছেন :

'' ''গভীর রাত্রে জগমোহনের চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া নামিয়া আসিলাম।

যাহা শুনিলাম তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল।

জগমোহন বলিল—'শিগ্‌গির চল্—বিপ্নের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। একটা বিড়ি দে চট্ করে!''

জগমোহনের সঙ্গে দেখিলাম নিতাই করালী ও হাবুল রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে ভীতচকিত ভাব।

জগমোহন বলিল—''তুই এদের নিয়ে এগো—আমি থানায় চললাম।''

বিপিনের বাড়ি গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

অজ্ঞান বিপিনের গোঁফ ও জুলফি অন্তর্হিত হইয়াছে।

পরিস্কার কামানো।

বউ পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে।

গ্রামের প্রান্তে বিপিনের বাড়ি। জগমোহনের বাড়ির পাশেই। বিপিনের বৃদ্ধ পিতা-মাতা সম্প্রতী তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন। কাছে-পিঠে এক জগমোহন ছাড়া আর কেহ নাই। সুতরাং ডাকাতির সুবিধা আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাকাতে গোঁফ ও জুলফি ব্যতীত আর কিছুই অপহরণ করে নাই। বিপিনের স্ত্রীর সহিতও তাহারা সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ :

''গভীর রাত্রে হঠাৎ কয়েকজন মুখোশপরা লোক প্রাচীর টপকাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং বিপিনকে ডাকিতে থাকে। বিপিন বাহির হইবামাত্র তাহারা তাহাকে ধরিয়া

চিৎ করিয়া ফেলে এবং একটা ঠোঙার মতো জিনিসে কি একটা ঔষধ ঢালিয়া শুঁকাইতে থাকে।

বিপিনের স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশী জগমোহন যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, তখন দস্যুগণ বিপিনের গোঁফ ও জুলফি কামাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিবরণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

একটু পরেই স-দারোগা জগমোহন আসিয়া হাজির হইল।

গম্ভীরভাবে সব শুনিয়া দারোগাবাবু কি সব টুকিয়া লইলেন।

তাহার পর হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন—''অদ্ভুৎ কান্ড! যাক, আর কোনও ভয় নেই''

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

দারোগাবাবু লোক ভালো।

জগমোহনের বন্ধু। নাট্যামোদী।

যে নাটকটি অভিনয় হইবে তাহাতে তিনিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

জগমোহন আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিল এবং বলিল—'' দে একটা বিড়ি দে।''[৩৩খ]

—'জগমোহন' গল্পে বিপিনের এমন পরিনামে এবং জগমোহনের গ্রাম-প্রীতির অতিশয়তায় অদ্ভুৎ কান্ডকারখানা পাঠকের হৃদয়ে নির্ভেজাল হাসির সঞ্চার করে।

'প্রস্তর সমস্যা' গল্পে স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। গল্পটির কাহিনি থেকে জানা যায় পুন্ডরীকাক্ষবাবুর ছোড়া পাথরের আঘাতে গল্পকথক আঘাত পান এবং পাথরটিকে প্রমাণ হিসেবে নিজের কাছে রেখে পুন্ডরীকাক্ষবাবুর বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মামলার স্বরূপ বদলে যায়। গল্পকথক ও পুন্ডরীকাক্ষবাবু উভয়েই পাথরটি নিজেদের বলে দাবী করতে থাকেন। গল্পকথক আদালতে শপথ করে বলেন :

'' পুন্ডরীকাক্ষ আমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারেন নাই। তাঁহার সহিত আমার কোনও কলহ নাই, আমি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া মস্তকে আঘাত পাইয়াছি। প্রস্তরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।''[৩৩গ]

অন্যদিকে পুন্ডরীকাক্ষবাবুও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি দাবী করে বসলেন পাথরটা তাঁরই এবং গল্পকথক সেটি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল বলে তিনি তাকে ঢিল ছুঁড়েছিলেন। আসলে দুজনেই জানতে পেরেছিলেন পাথরটি সাধারণ পাথর নয়, ''অতিশয় দামী এক খন্ড হীরা।'' পাথরটিকে

কেন্দ্র করে দুজন বিবাদমান মানুষের এরকম বিপরীত আচরণে গল্পের মধ্যে স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আবহ সঞ্চারিত হয়ে যায়।

'স্মৃতি' গল্পে হাল্কা হাসির বাতাবরণে এক সুন্দর সুখানুভূতির স্পর্শ রয়েছে। যা কিছু অসঙ্গত তাই পাঠকের হৃদয়ে কৌতুক উৎপাদন করে। সেই অসঙ্গতি যখন অতিশয় ভালোর দিক থেকে হয় তখনও তা একই রকম হাসির জন্ম দেয়। 'স্মৃতি' গল্পে বনফুল এমন এক দিলদরিয়া চরিত্রের মানুষের আখ্যান বর্ননা করেছেন যা বাস্তবে খুব একটা পরিচিত নয়। সে মানুষটি পেশায় একটি ছোট ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় থেকে আরম্ভ করে আশ্রয়হীন পথচারী সকলের জন্যই তার অবারিত দ্বার। অদ্ভুত আতিথেয়তায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রতিদিন প্রায় কুড়ি বাইশজন লোক তার বাড়িতে খায়। এখানেই শেষ নয়, শীতকালের ভোরে দূরদূরান্তের যাত্রীরা তারই উদ্যোগে বিনা পয়সায় চাও খেতে পায়। এক অদ্ভুত দিলদরিয়া মানুষ এই ষ্টেশন মাষ্টার। ষ্টেশন মাষ্টারের উপর সকলেরই এক অদ্ভূত রকমের আবদার ছিল। গল্পকথকও তার এই দুর্লভ আতিথেয়তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গল্পকথককে আহত করেছিল আরেকজন মানুষের আতিথেয়তা। তিনি আর কেউ নন সেই ষ্টেশন মাষ্টারেরই পুত্র মন্মথ। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে গল্পকথক তাঁর পূর্বপরিচিত মন্মথর সংবাদ পান। মন্মথ বিলেত থেকে ফিরে ভালো চাকরী পেয়েছে। গল্পকথক তার ঠিকানা পেয়ে তার বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বেরিয়ে আসে মন্মথ। তারপর গল্প থেকে তুলে ধরা যেতে পারে :

> ''ও আপনি এসেছেন—''
>
> ''অনেক দিন দেখিনি। ভাবলাম—''
>
> ''বেশ করেছেন। উঠেছেন কোথায়—''
>
> ''কোথাও উঠিনি এখনও। হাওড়া ষ্টেশনে বেচুলালের সঙ্গে দেখা, সেই তোমার খবর আর ঠিকানা দিল। সোজা এখানেই চলে এলাম।...''
>
> মন্মথ হাত ঘড়িটা একবার দেখিল। তাহার পর বলিল—''আমার বাসায় আজ মোটে জায়গা নেই। একে ছোট বাসা, তার উপর আমার শালী ভায়রাভাই সবাই এসেছেন। চলুন আপনার থাকবার জায়গা একটা ঠিক করে ফেলা যাক আগে। বেশি রাত হয়ে গেলে হোটেলেও জায়গা পাওয়া যাবে না।''[৩৪]

—মন্মথর এই ব্যবহারে গল্পকথক কোথায় যেন একটু আঘাত পেলেন। হয়তো আঘাত পাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু মন্মথ যে সেই মাষ্টারমশাইয়ের ছেলে। পিতা-পুত্রের আচরণের এই বৈপরীত্যে পাঠকের হৃদয়ে স্মিত হাসি সঞ্চারিত হয়।

'ভদ্রলোক' গল্পে গল্পকথক আগাম যাওয়ার সংবাদ চিঠিতে লিখে বিবেকের দংশনে ভুগতে ভুগতে হাওড়া ষ্টেশনে গভীর রাতে পৌঁছে দেখেন জ্যোতিনবাবু সেখানে নেই। অগত্যা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জ্যোতিনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন বাড়িতেও তিনি নেই। জ্যোতিনবাবুর মেয়ের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাইরে গেছেন। বাড়ি ফিরে এসে জ্যোতিনবাবুকে যে চিঠি তিনি লিখলেন সেখানেই বোঝা গেল যে বিবেক দংশনের কথা বারবার তিনি বলছিলেন সেটি আসলে কি। জ্যোতিনবাবু সেই রাতে সেদিন বাড়িতে না থেকে সেই বিবেক দংশনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন গল্পকথককে। গল্পকথক চিঠিতে লিখলেন :

''নমস্কারান্তে নিবেদন,

বিবাহের সময় মেয়েদের যে গরু ভেড়ার মতো করিয়া দেখা উচিত নয় এই মতবাদ আমি বহুকাল হইতেই পোষণ করিতেছি। তথাপি নিজের ভাবী পুত্রবধূকে ঘটা করিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। আপনাকে একটি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম; বোধহয় সেটি পান নাই। ভালোই হইয়াছে, পাইলে হয়তো আপনি থাকিতেন এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিজলীর চুল, দাঁত, নখ, রং, চেহারা দেখিয়া, তাহার গান শুনিয়া, সে কি কি রান্না করিতে পারে তাহার ফর্দ লইয়া বিবেককে বলিদান দিয়া আসিতাম। আপনার হয়তো অসুস্থ আত্মীয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। পরমেশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তবু বিজলীকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। আপনার সুবিধা মত যে দিন স্থির করিবেন, সেইদিনই তাহাকে পুত্রবধূ রূপে বরণ করিয়া আনিব। আমার নমস্কার জানিবেন। বিজলীর মামা কেমন আছে জানাইবেন। আশা করি আশঙ্কার কিছু নাই।

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীযজ্ঞেশ্বর আইচ''[৩৫]

পাঠক হৃদয়ে গল্পকথকের বিবেকদংশন নিয়ে যে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসনে স্মিত হাসি সঞ্চারিত হয়ে যায় ।

'দশবছর' গল্পটি রোমান্টিক প্রেমানুভূতির গল্প হলেও স্নিগ্ধ কৌতুক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। গল্পের নায়ক সোমনাথ চিঠি লিখতে বসেছে তার পূর্বপ্রেমিকা পুষ্পকে দশ বছর আগে যার বিবাহ হয়েছে মিষ্টার রজত রায়ের সঙ্গে। এবং যে বর্তমানে বিলেতে থাকে।

প্রেমিকার বিবাহ হলেও সোমনাথ তাকে ভুলতে পারে না। এদিকে ঘটনাচক্রে মিষ্টার রজত রায়ের মৃত্যু হওয়াতে সোমনাথ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিয়ে। পুষ্প কথা দেয় সে ফিরে আসবে। এরকম অবস্থায় রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন সোমনাথ প্রেমিকাকে চিঠি লিখতে বসে। চিঠি লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর রোমান্টিক হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে যখন সে নীচে নেমে আসে তখন সোমনাথ বিস্মিত হয়ে যায় কারণ নেমেই সে দেখে একটি মোটা-সোটা ঘাড়-গর্দানে মেয়ে বাড়ির নম্বর দেখে বেড়াচ্ছে। কথোপকথনে দুজনেই দুজনকে চিনতে পারে। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রোমান্টিক কল্পনার এরকম পরিসমাপ্তিতে পাঠক স্নিগ্ধ কৌতুক অনুভব করে।

'শ্রীধরের উত্তরাধিকারী' গল্পটি একই সঙ্গে ব্যঙ্গপ্রধান ও পরিণামে স্মিত হাসি উদ্রেককারী। শ্রীধর মিত্র অত্যন্ত কৃপণ। তার কৃপণতার কারণে সকলেই তাকে মক্ষিচুষ বলে ডাকে। লেখক জানিয়েছেন :

> ''শ্রীধরের তিনকুলে কেহ নাই। আত্মীয় স্বজন সকলেই একে একে পরলোক গমন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন শ্রীধর নিজে এবং তাঁহার পুরাতন ভৃত্য নকুড়। নকুড় অবশ্য শুধু ভৃত্য নয়। সে একাধারে পাচক, ভৃত্য, বন্ধু, পরামর্শদাতা—সব। দিনে নকুড় ভাতে-ভাত ফুটাইয়া দেয়। রাত্রে হরি গোয়ালা সুদ-পরিশোধকল্পে যে দুধটুকু দিয়া যায় তাহাই উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট! জলখাবারের পাট নাই। পোশাক-পরিচ্ছেদের খরচও নাই বলিলেই চলে। আইন বাঁচাইবার জন্য যতটুকু আবরণ প্রয়োজন ততটুকুই শ্রীধর মিত্র অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। দিনে সূর্য এবং রাত্রে রেড়ির তেলের ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ তাঁহার অন্ধকার মোচন করিয়া থাকে।''[৩৬]

সুতরাং শ্রীধরের জমানো টাকার অঙ্ক ক্রমশই বেড়ে চলছিল। এত টাকা সত্ত্বেও কাউকে অথবা কোন হিত কার্যে সামান্য অর্থও তিনি কখনো দেননি। ফলস্বরূপ কেউই তার উপর প্রসন্ন ছিলেন না। এদিকে শ্রীধরের বয়স বেড়েই চলেছে। মৃত্যু-চিন্তা তাকে গ্রাস করেছে। শ্রীধর কিছুতেই ভেবে পান না তার মৃত্যুর পর সঞ্চিত অর্থের প্রকৃত সদ্‌গতি কীভাবে হবে। অবশেষে একদিন শ্রীধর এমন ভান করলেন যে তিনি যেন মরে গেছেন। তার সৎকার্য করার জন্য একজন ছাড়া কেউই এগিয়ে এলেন না। ভৃত্য নকুড় তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই শ্রীধর জেগে উঠলেন। আসলে মড়ার ভান করে তিনি দেখতে চাইছিলেন তার প্রকৃত হিতৈষী কে? ভৃত্য নকুড়ের কাছে সব কিছু শোনার পর সিগারেটখোর ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলেন। এবং তাকেই তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলেন। অবশ্য ভৃত্য নকুড়কেও বঞ্চিত করলেন না। অর্থলোভী কৃপণ

মানুষের অন্তরেও যে ভালোবাসার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে এ গল্পটিতে বনফুল তাই দেখাতে চেয়েছেন।

'বাল্মীকি' গল্পে বনফুল মানুষের ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্নিহিত কিছু স্বভাব-দোষের প্রতি মৃদু কটাক্ষ করেছেন। গল্পকথক অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের মানুষ। কোথায় কোন জিনিস সস্তায় পাওয়া যায় তা তার নখদর্পণে। তার মনে সবসময়ই সন্দেহ যে তার চাকর হয়তো বাড়ির এটা সেটা সরিয়ে নেয়। তার সব সময়ই মনে হয় এটা নেই, সেটা নেই। এমনকি দেশলাইয়ের দশটি কাঠি কম হলেও সে তা সহজেই বুঝতে পারে। আর সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে চাকর গোবর্ধনের উপর। এহেন চাকরকে পাহারা দেওয়ার জন্য একদিন তিনি বিয়ে করাই স্থির করলেন। পত্নীর নাম শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। নববধূকে চাকরের উপর কড়া নজর রাখার কথা বলে যখন গল্প কথক নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন তখনই হঠাৎকরে তিনি অসময়ে বাড়িতে এসে আবিষ্কার করলেন:

> ''ঢুকিয়াই দেখি গোবর্ধন মনের আনন্দে বিড়ি ফুঁকিতেছে—।
>
> আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, সেদিনকার অবরুদ্ধ ক্রোধ বোমার মতো ফাঁটিয়া পড়িল। গোবর্ধনের গালে ঠাস করিয়া একটি চড় বসাইয়া দিলাম।
>
> গোবর্ধন মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহারপর হেঁট হইয়া আমার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। জুতা দুইটি খুলিয়া লইয়া স-সম্ভ্রমে বলিল, ''বউমা এই সবে শুয়েছেন, একটু পা টিপে টিপে ওপরে যাবেন বাবু—''
>
> ''পা টিপে টিপে? তার মানে—''
>
> ''আমাকে তাই তো হুকুম দিয়েছেন, বলেছেন, দেখো সিঁড়িতে যেন কোনও শব্দ না হয়—''
>
> পা টিপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা, মানে—
>
> অচিন্তনীয়—! মনু নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির বইতেছে! আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিল। গালে টোল পড়িল। বইটি দেখিলাম একটি ইকনমিকস্ বিষয়ক বই।''

কৃপণতার এই পরিণতি যথেষ্ট কৌতুককর।[৩৭]

'বাইজোভ' গল্পটিও কৌতুকরসের গল্প। তবে হাল্কা ব্যঙ্গও আছে। বর্তমান সভ্যতায় অপ্রিয় সত্যকে ক্রীম পাউডার মাখিয়ে পরিবেশন করবার প্রয়াসকে এ গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাই অত্যন্ত কালো হওয়া সত্ত্বেও এ গল্পের প্রধান নারী চরিত্রের নাম রাখা হয়েছে সুনীলা।

তবে সুনীলা কালো হলেও চোখে মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। সুনীলার বাবা মায়ের ইচ্ছে ছিল এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যেন প্রতিবেশীরা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সুনীলার বিয়ে হয় যার সঙ্গে সেই পাত্র সেরকম তো নয়ই বরং তার উল্টো। নামটাও অত্যন্ত সেকেলে ধরণের—গোবর্ধন। গোবর্ধনের শ্বশুর বাড়ি যাওয়া নিয়েই মূলত গল্পটি। মূল গল্প থেকে কিছুটা তুলে ধরা যেতে পারে গল্পরস আস্বাদনের জন্য :

''গোবর্ধন প্রথম শ্বশুরবাড়ি বালীগঞ্জে এসেছে। তাকে দেখে সবাই হকচকিয়ে গেল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গায়ে কটা বুকবন্ধ জিনের কোট, পায়ে রং-চটা ডার্বি শু। মাথার চুল কদম ছাঁট। সে সাবান মাখে না, গন্ধ তেল মাখে না। পাউডার ব্যবহার করে না। টুথপেষ্টের বদলে দাঁতন ব্যবহার করে। সর্ষের তেল মাখে রোজ আধ ঘন্টা ধরে। এই জানোয়ার দেখে সবাই তো অবাক।

গোবর্ধন বললে ''একটু বেড়িয়ে আসি।''

সুনীলা বললে—''না, ওই বেশে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। যেতে হলে ভদ্রবেশে যাও।''

''বেশ, ভদ্র বেশ তুমিই পছন্দ কর। যা পরতে বলবে তাই পরব।''

সেই দিনই সুনীলা আবিষ্কার করল যে গোবর্ধন লেংটিও পরে। পালোয়ানদের মতো।

বলল, —''ছি ছি লেংটি বড় ভালগার। ও পরতে হবে না।''

''ওটা না পরলে আমার কেমন যেন স্বস্তি হয় না।''

''কেন আন্ডারউয়ার পর না।''

''না লেংটিই থাক। ওটা তো ঢাকা থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না।''

গোবর্ধন লেংটির উপর কোঁচানো শান্তিপুরী ধূতি পরল, সিল্কের গেঞ্জি পরল, সিল্কের পাঞ্জাবি চড়াল, হাতে পরল সর্বাধুনিক সোনার রিষ্টওয়াচ। আঙ্গুলে হীরের আংটি।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত গোবর্ধনকে ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লো সবাই। নতুন জামাইকে সম্বর্ধনা করবার জন্য এসেছিলেন মিষ্টার গোহ, মিস্টার চাকরাভারটি, মেজর গাগা, ডকটর তরফদার। সবাই স্যুট পরা আধুনিক ভদ্র লোক। আধুনিকা মহিলাও ছিলেন কয়েকজন। রাত দশটার পরে গোবর্ধন এল।

পরিধানে লেংটি ছাড়া আর কিছু নেই।

''কি ব্যাপার!''

''সব কেড়ে নিয়েছে। ভাগ্যে লেংটিটা পরেছিলাম, তা না হলে উলঙ্গ হয়ে আসতে হত।''

মেজর গাগা সবিস্ময়ে বলে উঠল—''বাইজোভ''[৩৮]

প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অসামঞ্জস্যের ফলে এ গল্পে হাস্যরস জমে উঠেছে।

প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অসামঞ্জস্যের ফলে বনফুলের অনেক গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। এরকমই একটি গল্প **'শিল্পীর ক্ষোভ'**। মদন ঘোষাল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে শিল্পীসুলভ আনন্দসহকারে উপভোগ করতে চান। কিন্তু যখনই তা ঘটে না তখনই হতাশ হয়ে পরেন তিনি। গল্পটিতে হাস্যরসাত্মক মুহূর্তগুলি অনুভব করার মতো। যেমন মেয়ের বিয়েতে তত্ত্ব করবার সময় বেয়াই মশাইকে তিনি জানিয়েছিলেন :

''আমি গরিব মানুষ, আপনার মর্যাদা রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমার। বেশি কিছু পাঠাতে পারলাম না। একটি মাত্র মিষ্টান্ন পাঠাচ্ছি, দয়া করে গ্রহণ করলে বাধিত হব।''

—বেয়াই মশাই চিঠি পড়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মিষ্টান্ন দেখে তিনি অবাক হলেন :

''বিশাল একটা কড়ায় বিড়াট একটা পানতোয়া প্রচুর রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। কড়ায় আঁংটায় বাঁশ গলিয়ে ষোলজন লোক বয়ে এনেছে। খবর নিয়ে জানতে পারলেন পানতোয়াটির ওজন একমণ।''[৩৯]

প্রত্যাশার এই অসঙ্গত প্রাপ্তিতে সত্যিই আমোদ অনুভব হয়।

বাস্তবতা বর্জিত নীতি ও আদর্শের আতিশয্য কতটা হাস্যকর হয়ে ওঠে তার বড় দৃষ্টান্ত বনফুলের **'বিবেকী শিবনাথ'** গল্পটি। ভালো ছাত্র শিবনাথ নীতি ও আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। সসম্মাণে বি.এ পাস করার করার পর শিবনাথ মানুষকে খাঁটি দুধ সরবরাহ করার মানসে দুধের ব্যবসা আরম্ভ করল। হিসেব নিকেশ সে ঠিকই করেছিল কিন্তু দুধ সংগ্রহ করতে গিয়ে যে রাত দুটোর সময় প্রতিদিন তার ঘুম ভাঙবে না তা শিবনাথ কল্পনা করেনি। ফলে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই চলে গেল চাকরের কাছে। সুতরাং খাঁটি দুধ বিক্রি করবার যে প্রত্যয় সে করেছিল তাও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গেল। অতএব বিবেকী শিবনাথ দুধের ব্যবসা ছেড় দিল। এরপর সে পুলিশের চাকরী পেল। অপবিত্র পুলিশ লাইনে একটা পবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সুযোগ পেয়ে সে রীতিমত পুলকিত হয়ে উঠল। প্রথম থানার চার্য গ্রহন করার পর উপর মহল থেকে তার উপর দায়িত্ব পড়ল তার থানা এলাকার জমির যাবতীয় তথ্যের নিখুঁত বিবরণী তৈরী করার। মাস দুই

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে শিবনাথ নিখুঁতভাবে জরিপ শেষ করার পর যখন থানায় ফিরল তখন দেখল তার জায়গায় নতুন দারোগা এসে নিযুক্ত হয়েছে। শিবনাথের কাছ থেকে সব জেনে নতুন দারোগাবাবু তাকে বললেন :

" ''আপনি নিজে জমি মেপে বেড়াচ্ছিলেন? উফ্''—হাঁটু চাপড়াইয়া আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন।

''এর থেকে স্ট্যাটিস্টিকস্ তৈরি হবে কি না তাই ভাবলাম নিজে দেখে ঠিক ফিগারগুলো দেওয়া উচিত।''

''গবর্নমেন্টের এইসব স্ট্যাটিস্টিক্সের ফিগার কারা দেয় জানেন?''

''কারা?''

''চৌকিদারের বউয়েরা। আমরা ফরমাশ করি চৌকিদারদের, আমার বিশ্বাস, তারা খবরটা সংগ্রহ করে তাদের বউদের কাছ থেকে। আমরা সেটা টুকে পাঠিয়ে দিই আগের দু'তিন বছরের ফিগারের সঙ্গে 'কম্পেয়ার' করে। আপনি নিজে জমি জরিপ করতে গেছেন?''

দারোগাবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শিবনাথ অপ্রস্তুত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।''[৪০]

অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের প্রতি মানুষের আস্থা চিরন্তন। আধুনিককালের অতি আধুনিক যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতাও এর কাছে হয়েছে পরাভূত। আমাদের জানা রহস্যের পরপারে এমন এক বিশ্বাস থাকে, যা আমাদের সচকিত করে, ভীত করে। এই জানা বিশ্বাস থেকে গা ছমছম করা এক অজানা অনুভূতির জন্ম হয়। এই অজানা অনুভূতি একেবারেই সর্বজন স্বীকৃত বাস্তব কার্যকারণসম্মত সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাসের অনুগামী নয়, বরঙ তার উল্টো, প্রত্যক্ষ কার্যকারণবোধের তা বিপরীত বা বিরোধী। এটাই তো অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত। সুপ্রাচীনকাল থেকেই কবি সাহিত্যিকেরা অতিপ্রাকৃত অনুভূতিকে নিয়ে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ বোধ করেছেন। গ্রিম ভাইদের পরীর গল্প, আরব্য রজনীর গল্প, বেতালের গল্প এর নিদর্শন। এই অতিপ্রাকৃত ভাবনা একালের সাহিত্যিকদেরও একটি প্রিয় বিষয়। এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই অতিপ্রাকৃত গল্পকে যখন কোন গল্পকার তার সাহিত্যে রূপ দেন তার মধ্যে নিহিত থাকে তার নিজের জীবনেরই ঘটে যাওয়া কোন রহস্যাবৃত ঘটনা। স্বভাবত বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী হলেও এই অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ভাবনা থেকে বনফুলও বেরিয়ে আসতে পারেননি। যেহেতু জীবনের অভিজ্ঞতা অনুভবের মধ্যেই বনফুল খুঁজে

পেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির উপকরণ, তাই জীবনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে অলৌকিক রহস্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি এবং তাকে গল্প উপন্যাসের বিষয়ীভূত করেছেন। প্রশ্ন হল বিজ্ঞান নিয়ে যার কারবার, কুসংস্কারকে দূরীভূত করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদের জ্ঞানের আলোকে নিয়ে আসা যার ব্রত অতিপ্রাকৃত ভাবনা তাকে গ্রাস করল কীভাবে। আসলে এমন কিছু ঘটনা তাঁর নিজের জীবনে ঘটেছিল যুক্তি দিয়ে যার কোন ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পাননি। তাকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকারও করতে পারেননি। নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত অলৌকিক ঘটনাগুলি বনফুল তাঁর অনেকগুলি গল্পে তুলে ধরেছেন। এই সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম 'পক্ষী বদল', 'ঘটনা', 'ফ্রেমে বাঁধানো কার্ড বোর্ড', 'কেন', 'প্রমান', 'দুই তীরে' ইত্যাদি। এর পাশাপাশি বনফুল আরও এক শ্রেণীর গল্প রচনা করেছেন যেখানে মানুষের অলৌকিক সংস্কারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আসলে অলৌকিক রহস্য যেখানে সত্যি সত্যি অলৌকিক সেখানে তাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন বনফুল। কিন্তু অলৌকিক বিশ্বাস যখন অন্ধসংস্কারে পর্যবসিত হয় তখন তাকে বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি তিনি। অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতাকে গল্পের আধারে কৌতুকের বক্র কটাক্ষে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'বাঘা' গল্পটির কথা :

> ''তারিণীচরণ মিত্রের পোষা কুকুর বাঘা নিতান্তই দেশী কুকুর। নগন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কর্ণ, রোম বা পুচ্ছে বৈদেশিক কোনও প্রকার ভব্যতা বা বৈচিত্র্যও নাই। সাধারণ দেশী কুকুর, তবে চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, পর্যাপ্ত আহারপুষ্ট। বাঘাকে সহসা দেখিলে অপরিচিত কোনও ব্যক্তির মনে ত্রাস সঞ্চার হয়তো হইতে পারে। কিন্তু যে বাঘার একবার পরিচয় পাইয়াছে সে বাঘাকে দেখিয়া বিচলিত হইবে না। কারণ বাঘার মতো অমন একটি ভীতু কুকুর সচরাচর দেখা যায় না। পটকা ছুঁড়িলে বাঘা হুড়মুড় করিয়া তক্তাপোশের তলায় ঢুকিয়া পড়ে, মাথা চুলকাইলে ছুটিয়া পালায়, ভাবে ঢিল ছুঁড়িল বুঝি! কারণে অকারণে তাহার লাঙ্গুলটি সর্বদাই প্রায় পিছনের পদদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এটাই বাঘার পরিচয়। বেচারা বাঘা নিজের নাম সার্থক করিতে পারে নাই।''[৪১]

এ বাঘারই হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেল শিরোমণি মশায়ের জ্যোতিষ গনণার সূত্রে। শিরোমণি মশায় বাঘার মধ্যে আবিষ্কার করলেন এক বৎসর পূর্বে প্রয়াত তারিণীচরণের অগ্রজ সরোজকুমারকে। কোষ্টি মিলিয়ে শিরোমণিমশায় ঘোষণা করলেন :

> ''ও সরোজ। কুকুর যোনিপ্রাপ্ত হয়েছে। ভাগ্য ভালো যে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। যত্ন-আত্তি করো ওকে। আর একটা স্বস্ত্যয়ন করানো দরকার। পরজন্মটায় যাতে সদগতি হয়। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!'' [৪২]

এ কথা শুনে তারিণীচরন কুকুর যোনীপ্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন তারিণীচরণের চাকরীটি চলে যাওয়াতে তারিণীচরন একটু বিমর্ষ হলেন। একই সঙ্গে কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাঘাও অন্নজল ত্যাগ করল। শিরোমণি শুনে বললেন :

''ও অন্নজল ত্যাগ করবে না? হাজার হোক দাদা তো! তা ছাড়া তুমি যে ওর প্রাণ ছিলে ভায়া! তোমার চাকরী গেছে শুনে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না তো কে করবে?''[৪৩]

এরপর বাঘা অন্ন জল গ্রহণ করেছিল কিনা তা গল্পে বলা নেই কিন্তু যেটা বলা আছে তা হল বাঘা মারা যাওয়ার পূর্বে তারিণীকে কামড়ে ছিল এবং তার কিছুদিন পরে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে তারিণীর মৃত্যু হল।

আলোচ্য গল্পে তারিণীচরণের এই করুণ পরিণতি অঙ্কণের মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃতের প্রতি অন্ধসংস্কার মানুষের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিকে নাস করে কীভাবে তাকে নিঃশেষ করে দেয় সে সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন।

গুণীন ওঝাদের প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে লেখা বনফুলের 'দ্বিবা-দ্বিপ্রহরে' গল্পটি এখানে উল্লেখ্য। দারুণ দ্বিপ্রহরে গ্রামের এক জায়গায় ভীষণ ভীড়। হারু ঘোষের পুত্র ন্যাপলাকে দংশন করেছে যে বিষধর সাপটি সেটি ধড়া পরেছে। বল্লমবিদ্ধ প্রকান্ড বিষধর সাপটি ভয়াবহ ফণা তুলে তর্জন করছে আর তা দেখতেই গ্রামের মানুষ সেখানে ভীড় জমিয়েছে। হঠাৎই ভীড়ের মাঝখানে অদ্ভুত চেহারা বিশিষ্ট, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, তৈল বিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন, ময়লা হাফপ্যান্ট এবং একটা ময়লা গোছের ফতুয়া পরিহিত একটি আগুন্তুক সেখানে হাজির হয়। তার অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে উপস্থিত জনতার বুঝতে অসুবিধা হয়না যে সে একজন মস্ত বড় গুণী ওঝা। হারু ঘোষ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্পাহত পুত্রকে নিয়ে হাজির হয় সেখানে। বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখে সনাক্ত করে অবশেষে জানাল যে ''লোকটি একটি পাগল, পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।''[৪৪] মস্তবড় গুণিনের আসল স্বরূপ উন্মোচিত হল।

বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মানুষের জীবনের রাহস্যিকতা সম্পর্কে ছিল তাঁর অসম্ভব কৌতূহল। এই কৌতুহল তাকে তাড়িত করেছিল অলৌকিকের প্রতি আস্থাবান হতে। কিন্তু বিচারবোধহীন অন্ধবিশ্বাস যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই তাকে বনফুল তাঁর বিভিন্ন গল্পে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত 'বিদ্যাসাগর' এরকমই একটি ছোটগল্প।

গল্পকথক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। হঠাৎ করেই তিনি ধার্মিক হয়ে পড়েন এবং জন্মান্তর রহস্য উদঘাটন করতে শেখেন। যে ছাত্র 'সাধু' শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে মুণি শব্দের

দ্বিতীয়ার 'দ্বিবচন', 'নর' শব্দের দ্বিতীয়ার 'একবচন' কি হবে বলতে পারে না তার জন্মান্তর রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন :

''একি—এ যে বিদ্যাসাগর!

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর!

স্বয়ং উপক্রমনিকা'কার জন্মান্তর রহস্যের ফেরে পড়িয়া নর শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছে না! আশ্চর্য ব্যাপার!

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভূলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আর আমার শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি—

অশ্রুজলে তাহার চরণখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা!

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম শাসন করিতে পারি নাই—সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।''[৪৫ক]

—এরফলে যা হওয়ার তাই হল। ফোর্থক্লাস থেকে সে আর কিছুতেই প্রমোশন পেল না। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সে ছাত্রের আর পাশ করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গল্পকথকের মনে মূঢ় সংস্কার এমন ভাবে দানা বেঁধেছিল যে কোন ভাবেই সে তার বিদ্যাসাগরীয় মহিমা মন থেকে সরাতে পারেনি। তাই বছর পাঁচেক পরে সেই ছাত্র কিছুদিন থিয়েটারের অভিনয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে যখন লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট হয়ে তার কাছে ইনসিওর করানোর জন্য এল তখন সাধ্যাতীত হলেও কথক তাকে ফেরাতে পারেননি। এমনকি ইনসিওরেন্সের এজেন্টের কাজেও সেই ছাত্র বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে যখন অনেকদিন পর গল্পকথকের কাছে আবার হাজির হয়ে বলল : ''ওই মোড়টায় ডিসপেনসারী খুলেছি মাষ্টার মশায়, দয়া করে যাবেন মাঝে মাঝে।''[৪৫খ]—তখনও প্রতিশ্রুতি না দিয়ে পারলেন না তিনি। আসলে আর কেউ না জানুক গল্পকথক জানেন যে গত জন্মে এই ছেলেটিই তো ছিল বিদ্যাসাগর। সেই মূঢ় সংস্কার থেকে তিনি আর বেরোতে পারেননি। মানুষের এই অন্ধ বিশ্বাস, বিচারবোধহীনতাকেই বনফুল কটাক্ষ করেছেন এ গল্পে। যে অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন গল্পকথক তার কোন আদৌ বাস্তব ভিত্তি নেই। তাই গল্পকথকের জন্মান্তরবাদের

রহস্য উদঘাটনের শিক্ষাগুরু স্বামী চিন্ময়ানন্দ যে চৌর্য অপরাধে জেল খাটছেন একথাও পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন।

'পাকা রুই' গল্পে বনফুল বলেছেন : ''পরশুরাম বিরিঞ্চিবাবা এঁকেছেন ওই হল ভন্ডামীর পারফেক্ট টাইপ।'' **'ঘরে বাইরে'** গল্পে ভন্ড জ্যোতিষীর আরেকটি টাইপ অঙ্কণ করেছেন বনফুল। বিনামূল্যে গল্পকথকের হাত দেখে বর্তমান সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ''আজ আপনার একটি অর্থনাশ যোগ রয়েছে।' আর 'বন্ধুদের শত্রু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।''[৪৬ক] অবশ্য ইতিমধ্যে যে ঘরে বসে তিনি হাত দেখছিলেন, গল্পকথকের সেইঘরে সামান্য অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ড্রয়ার থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন তার মানিব্যাগটি। ফলে জ্যোতিষীর প্রবল ভবিষ্যৎ বাণী মিলতে কোন অসুবিধে হয়নি। জ্যোতিষীর দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণীটিও মিলেছে স্ত্রীর মানভঞ্জনের জন্য ঢাকাই শাড়ী কিনতে গিয়ে। লেখকের কথায় :

> ''যতীন, বীরেন, সুইল, বিশু, হাবলু, পরেশ, কালু—সকলের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছি। দশটা টাকা কেহ ধার দিতে পারিল না। শেষটা দোকান হইতে ধারে কাপড় কিনিতে হইল। ইহারা বন্ধু।''[৪৬খ]

এরকমভাবে গল্পের শেষে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী মিলে যাওয়ায় পাঠকের হৃদয়ে কৌতুক সঞ্চারিত হয়।

স্বদেশিয়ানার প্রতি ব্যক্তি বনফুল কখনোই গোঁড়া ছিলেন না। অতিরিক্ত আবেগের বশে স্বদেশী জিনিস তা যতই খারাপ হোক তাকে ভালো বলতে হবে এররকম মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন না তিনি। তাই স্বদেশিয়ানার ভালো দিকের তিনি যেমন প্রশংসা করেছেন তেমনি এর খারাপ দিকগুলিকেও নির্দ্বিধায় ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। **'দেশী ও বিলিতী'** গল্পে একটি ঘটনাকে সামনে রেখে দেশী ও বিলাতীর তুলনার মধ্য দিয়ে একটির উৎকর্ষতা ও অন্যটির নিকৃষ্টতার দিককে তুলে ধরেছেন। ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত একটি মুমূর্ষু শিশুকে বাঁচাতে পল্লীগ্রাম থেকে ডাক্তারবাবু প্রথমে দেশি দোকান থেকে ও পরে বিলাতী দোকান থেকে ওষুধ আনানোর ব্যবস্থা করেন। রোগীর মুমূর্ষু অবস্থার কথা বিবেচনা করে বিলাতী দোকান থেকে কর্মচারীর মাধ্যমে ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই ওষুধে শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু দেশী দোকান থেকে সাতদিন যাওয়ার পরেও ওষুধ আসে না, আসে একটি চিঠি, তাতে লেখা :

> ''প্রিয় মহাশয়,
>
> আজকাল নিম্নলিখিত হারে ডিপথেরিয়া অ্যান্টিটকসিনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত হারে আপনি ঔষধ লইবেন কিনা জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে তদনুযায়ী

ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি...''[৪৭ক]

জাতপাতের দ্বন্দ্ব নিয়ে বনফুল লিখেছেন 'অধ্যাপক সুজিত সেন' গল্পটি। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে আমরা বাইরে প্রেম সম্পর্কে যতই উদারতা ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠতে চাই না কেন অন্তরে সেটা এমনভাবে রক্তের মধ্যে নিহিত থাকে যে আমরা কিছুতেই সেখান থেকে বের হতে পারি না। অন্যের ক্ষেত্রে যতই আমরা জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠার কথা প্রচার করে মহানুভবতার পরিচয় দিই না কেন নিজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। আলোচ্য গল্পে অধ্যাপক সুজিত সেন হিন্দু মুসলমান মিলন সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করেন, কিন্তু তার মেয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে এতে তিনি খুশী হলেন না।

'যুগান্তর' গল্পে প্রাচীনপন্থী, সংস্কারবিলাসী ও নারীশিক্ষা বিরোধী এক বৃদ্ধের কার্যকলাপ হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে হাস্যরসের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে দুটি ক্ষেত্রে—একটি ছকরির বিবাহ ঘটনা ও দ্বিতীয়ত বৃদ্ধ পাঁচকড়ি পোদ্দারের গোয়ার্তুমি। পাঁচকড়ি পোদ্দার নারী শিক্ষার তো বিরোধী ছিলেনই তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষারও ছিলেন চরম বিরোধী। সেই মানসিকতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পুত্র ছকরীকে তিনি কিছুতেই কলকাতায় পড়াশুনা করতে পাঠাতে চান না। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মত :

> ''বি.এ, এম.এ পাস করিয়া দশটা মুন্ড, বিশটা হাত কিছুতেই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে, তাহাতেই বা কি? এই বাজারে অতগুলো হাত ও মুন্ড লইয়া হইবে কি!''[৪৭খ]

যাইহোক কলকাতায় ছকড়িকে পাঠাতেই হল স্ত্রীর আবদারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছকড়ির বিবাহের ব্যাপারেও অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। বাল্যবন্ধু কলকাতা নিবাসী বিশ্বনাথের কন্যাকে তিনি ছকড়ির পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করে রেখেছেন। একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে পোদ্দার মহাশয় পুত্র ছকড়িকে অবিলম্বে বাড়ি চলে আসতে বললেন। এর উত্তরে ছকড়ির চিঠি এল যে পিতাকে না জানিয়েই সে মাস খানেক আগে বিবাহ করে নিয়েছে। আকাশ থেকে পড়লেন পোদ্দার। বন্ধু বিশ্বনাথের কাছে মুখ দেখানোর ভয়ে তিনি তীর্থ যাত্রা করলেন। এরপর বন্ধু বিশ্বনাথেরই কাছে চিঠি মারফৎ খবর পেলেন যে ছকড়ি যাকে বিবাহ করেছে সে আর কেউ নয় বিশ্বনাথেরই মেয়ে। বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। এসে দেখলেন যে ছকড়ির খোকা হয়েছে। নাম রাখা হয়েছে অমল কুমার। নাম শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। এবং আবার তীর্থে চলে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু পথ রোধ করে বসলেন গিন্নী। তিনি তাকেই নামকরণ করতে বললেন নাতির। পোদ্দারমশাই নামকরণ করলেন 'নকড়ি'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বণিক ও শাসক ইংরেজের প্রশ্রয়ে আমাদের দেশে একশ্রেণীর অকর্মণ্য, ভোগাসক্ত, মেরুদন্ডহীন ইংরেজদের পদলেহনকারী মানুষেরা বঙ্গদেশে গজিয়ে উঠেছিল যারা বাবুসম্প্রদায় নামে পরিচিত। বাবুসম্প্রদায়ের বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খল নীতিহীন জীবনযাপনে বাঙ্গালীর একাংশ দেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। এই শ্রেণীর বাবুসম্প্রদায়ের অদ্ভুত আচার-আচরণ নিয়ে আমাদের দেশের বহু লেখক বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকরহস্য' গ্রন্থের 'বাবু' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে এই শ্রেনীর মানুষদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। অবশ্য তারও আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সমাজ বিষয়ক কিছু কবিতায় এই বাবু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ হেনেছেন। বাবু সম্প্রদায়ের বিচিত্র চালচলন আচার-আচরণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়ায়নি। **'শ্রীপতি সামন্ত'** গল্পে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের মাধ্যমে বাবু সম্প্রদায়ের দোষত্রুটিগুলির একটি বিশেষ দিককে উন্মোচিত করেছেন তিনি, যাতে মধ্যবিত্ত বাবু সম্প্রদায় নিজেদের চরিত্রের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং দোষগুলি সংশোধন করে। আলোচ্য গল্পে শ্রীপতি সামন্ত তৃতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট কেটে রাত্রি আটটায় স্টেশনে এসে দেখেন ট্রেনে তিল ধারণের স্থান নেই। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলছে। মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি, এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি মোটামুটি খালি। সেখানেও সাহেবি পোষাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসে আছেন, মুখে ধুমায়মান একটি পাইপ। শ্রীপতি সামন্ত অনেক ছোটাছুটি করেও কোথাও উঠতে পারলেন না, অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যাবেন। আর তাছাড়া শরীরের প্রয়োজনেই ওই রাত্রে ঘুম তাঁর বড় প্রয়োজন। কেননা বিগত তিন রাত্রে তাঁর ঘুম হয়নি। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি বুদ্ধি এল। গার্ডের সঙ্গে কথোপকথনরত ছোট বাবুকে গিয়ে ধরলেন যদি ফার্স্ট ক্লাসে একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বাধ সাধলেন প্রথম শ্রেণীর সাহেবী পোশাক পড়া যাত্রীটি। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, ''দ্যাট কানট বি! আই ক্যান্ট অ্যালাউ।'' সামন্ত মহাশয় কড়জোর করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় হল। সামন্ত মশায় কোনরকম কোন উপায় বেড় করতে না পেরে জোর করে উঠে পড়লেন ফার্স্ট ক্লাসে, সঙ্গে এক বান্ডিল খালি বস্তা। দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, দুটো প্রকান্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুটুলি এবং একটিন ঘি। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর যথাসময়ে 'ক্রু' এসে ভাড়া চাইলেন। সামন্ত মশায় 'ক্রু'র নির্দেশ মত নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। এরপর 'ক্রু' বাঙ্গালী সাহেবটির কাছে টিকিট চাইলে সে বলে 'মাই টিকিট ইজ ইন মাই স্যুটকেস, প্লীজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।''' কিন্তু

ক্রু নাছোড় বান্দা। অবশেষে দেখা গেল যে তার কাছে কোন টিকিটই নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি যাকে অবজ্ঞা করছিলেন সেই শ্রীপতি সামন্তই তার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

লেখক এই গল্পে পাশাপাশি দুটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন। একদিকে শ্রীপতি সামন্ত খুবই সাদামাটা লোক যার পরনে একটি আধ ময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলি ধূসরিত একজোড়া দেশী মুচীর তৈরী চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ফাটা চশমা এবং সুতা-বাধা চশমার ফ্রেম পরিহিত। অন্যদিকে সাহেবী পোশাক পরিহিত বাঙ্গালীবাবু যার মুখে ধুমায়মান একটি পাইপ, এবং বাঙ্গালী হলেও যিনি ইংরেজীতে কথা বলতে ভালোবাসেন। শ্রীপতি সামন্তর টাকা পয়সা থাকলেও কোনরকম ঠাটবাট নেই। তাই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটতেই তিনি অভ্যস্ত, অন্য দিকে ঠাটবাটের অভাব নেই কিন্তু টিকিট না কেটে ট্রেনে ফার্সট ক্লাসের যাত্রী। এই দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে লেখক বাবু শ্রেণীর চরিত্রের অন্তঃস্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। আসলে বনফুল ভন্ডামি সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি ভন্ড বাবু সম্প্রদায়ের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এখানে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হাস্যরসিক কিন্তু এমন হাস্যরসিক তিনি নন যিনি ব্যঙ্গের চাবুকে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে দেন। তাই অনেক গল্পে তিনি যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত এবং হিউমার রসসিক্ত। তাই বাবুবেশধারী টিকিটহীন ফার্সট ক্লাসের যাত্রীটিকে চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আর তা তিনি করেছেন তাকে দিয়েই যাকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত প্রচন্ড অবজ্ঞা করছিলেন বাবুটি। অথচ চাইলেই শ্রীপতি সামন্ত তাকে টিটকারী করতে পারতেন, তাকে করা অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিতে পারতেন পালটা অবজ্ঞা করে। কিন্তু সে পথে যাননি তিনি। বরং তিনি বলে ওঠেন—''ও কুরু মহাশয়, —বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি! কটা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—''[৪৮]

বনফুলের স্বদেশানুরাগের পরিচয়ও আলোচ্য গল্পে রয়েছে। ইংরেজীয়ানাকে তিনি এখানে ব্যঙ্গ করেছেন—

''বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বেশিক্ষণ বচসা চালানো শক্ত। সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।''[৪৯]

যে বাবুর ভাবখানা এমন যে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে কথা বলতে তিনি অপারগ তারও ফিরে আসতে হয়েছে রাষ্ট্র ভাষায়। এ ভাবেই অল্প বিদ্যায় ভয়ঙ্করী বাবুমশায়কে বনফুল ব্যঙ্গ করেছেন এখানে। আর শ্রীপতি সামন্তর সাজাত্যাভিমান অতিপ্রবল। তাই তো সাহেব তাকে জাত তুলে গালিগালাজ দিলে সে প্রতিবাদ করেছে :

''কটা বাঙ্গালী আপ্ দেখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোনদিশি ভদ্রতারে বাপু! দুর্গা শ্রী হরি - দুর্গা শ্রী হরি—''[৫০]

মানুষ প্রায়শই বাইরে হয় এক অন্তরে হয় আরএক। অন্তর বৈশিষ্ট্য অনেক সময়েই চাপা পড়ে যায় বাইরের অভিনয়ে, আচার আচরণে। তাই এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় যারা বাইরের মানুষদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণীয় কিন্তু ঘরের মানুষদের কাছে ভয়ঙ্কর। সে সব মানুষদের আচরণে ঘরের মানুষদের দুর্দশার শেষ থাকে না। আলোচ্য গল্পে বনফুল মানবমনের এই সূক্ষ্ম মনস্তত্বটিকে হাস্যরসের উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। রামের চরিত্রে অভিনয় করে সীতাঅন্তপ্রাণ যে মানুষটি সীতাবিহনে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, সীতার জন্যে যার মর্মন্তুদ হাহাকার দর্শকদের অন্তর স্পর্শ করেছিল সেই মানুষটিই অভিনয় শেষ করার পর প্রায় গলা পর্যন্ত মদ্য পান করে যখন বাড়িতে এসে বউ পেটানো শুরু করে তখন পাঠক হৃদয় একই মানুষের মধ্যে এই বিপরীতধর্মী দুটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে কৌতুকরসে অবগাহন না করে পারে না। এখানে বনফুল দুটি বিপরীতধর্মী দৃশ্যের অবতারণার মধ্য দিয়ে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন।

সহানুভুতি মানুষের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। কিন্তু সহানুভুতি ততক্ষণই ঠিক যতক্ষণ না পর্যন্ত তা নিজের স্বার্থকে বিঘ্নিত করে। নিজ স্বার্থকে বিঘ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে সহানুভুতির হাওয়া কীভাবে ঈর্ষার আগুনে পর্যবসিত হয় তা দেখানো হয়েছে **'স্ত্রী চরিত্র'** গল্পটিতে। একটি মাসিক পত্রিকায় 'গল্প নহে' গল্পটি পড়তে পড়তে সেই গল্পের নায়িকা নির্মলার জন্য শ্রীমতি সুনন্দার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। এমনকি গোপনে নির্মলার জন্য অশ্রু বিসর্জনও করল। কিন্তু সুনন্দা যখন জানতে পারল যে এই গল্পটি তার স্বামীরই লেখা এবং তার স্বামীর নিজের জীবনেরই ঘটনা এটি তখন ''ঈর্ষায় তাহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল। অথচ এই কয়েক ঘন্টা পূর্বে নির্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিল।''[৫১] স্ত্রী চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে এখানে হাস্যরসের মধ্যে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

সব মানুষই অল্পবিস্তর প্রতিবাদী। কিন্তু স্বার্থহানীর আশঙ্কায় অনেক সময়েই হারিয়ে যায় তার প্রতিবাদী সত্তা। তা না হলে **'শরশয্যা'** গল্পে নারীর লাঞ্ছনা শোনা মাত্র শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠত যে গল্প কথকের, সে গল্প কথকের চোখের সামনে নারীর শ্লীলতাহানী দেখেও তার প্রতিবাদী সত্তা বিনীত নমস্কারে পরিণত হত না। গল্পের নায়ক বিহারের একটি শহরের হোটেলে রাত্রী যাপন করছেন। সঙ্গে রয়েছে শ্বশুর মহাশয়েরের লিখে দেওয়া একটি পত্র। সেটি একজন ভদ্রলোককে দিতে হবে। তিনি চেষ্টা করলে একটা চাকরী জুটতে পারে। ট্রেনে আসার সময় নারী লাঞ্ছনার নানা খবর দেখে তার শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে উঠেছিল, প্রতিবাদী সত্তা জেগে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিবাদের সুযোগ না পেয়ে হোটেলে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল

সে। মাঝরাতে ছাড় পোকার কামরে হঠাৎ ঘুম ভাঙতে হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই তার চোখে পড়ল ঠিক নীচের গলিটাতে একটি গাট্টাগোট্টা গোছের লোক একটি বাড়ীর জানালায় উকি দিয়েই চোরের মত সরে গেল। গল্পের নায়ক ভাল করে উকি দিয়ে দেখল যে একটি যুবতী সেখানে শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তার প্রতিবাদী সত্তা গর্জে উঠল। হোটেলের ঘর থেকে দ্রুত পদে অবতরণ করে সে লোকটিকে সজোড়ে চর মাড়তে উদ্যত হয়ে হঠাৎই আবিষ্কার করল ইনিই সেই ব্যক্তি যার কাছে তিনি এসেছেন। উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করে বলতে হল : ''আপনার কাছেই এসেছি—বিমল বাবুর জামাই আমি।''[৫২]

এই গল্পে রয়েছে হাস্যরসের উপাদান, কিন্তু তা গভীর মননজাত নয়। সিচুয়েশন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। স্বপ্নে গল্পের নায়ক হোটেলের ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নে তিনি ভীস্মদেব হয়ে গেছেন, স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করে গল্পের নায়ক শরশয্যায় শয়ন করেছেন। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফণার উপর দেহভার রক্ষা করে তিলে তিলে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। প্রতি রোমকুপে মৃত্যুর আগমন বার্তা ঘোষিত হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল :

> ''আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না। কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা। স্কন্ধ ও পৃষ্ট দেশে যৎপরোনাস্তি কষ্ট।...তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম, টর্চটা জ্বালিয়া দেখি। সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছানো রহিয়াছে। অগুণতি ছাড় পোকা! দেওয়াল বহিয়া সারি সারি আরও নামিতেছে। সর্বনাশ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইলাম।'' [৫৩]

লেখকের বাচনভঙ্গী, শব্দ প্রয়োগ এ গল্পের হাস্যরস সৃজনে সহায়তা করেছে। যেমন খবরের কাগজ পড়ে গল্পকথকের :

> ''অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল।—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুন্ডটা ছিরিয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুন্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই।''[৫৪]

এছাড়া পাশ দিয়া ট্রেন যাওয়াতে 'সাৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম', স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রচুর ছাড় পোকার কামড় খেয়ে 'তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম' প্রভৃতি বাক্যগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে বনফুল এই গল্পটিকে যথার্থই একটি কৌতুকরসের গল্প করে তুলেছেন।

'দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা' গল্পে বনফুল অতি অলস, আরামপ্রিয় ও অন্যের প্রতি কৃত্রিম সহানুভূতি দেখানো মানুষদের চরিত্র স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। দেশের দুরবস্থার জন্য

আমরা ব্যথিত হই, বিগলিত হই অথচ বিন্দুমাত্র কর্তব্য করি না। ভাবনা ও কাজে বিস্তর অসঙ্গতি। একই চরিত্রের মধ্যে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরস্পর বিরোধী এই অসঙ্গতি বনফুলের এই গল্পে ফুটে উঠেছে।

কেনারাম তার রোজনামচায় লিখেছে :

> ''মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে আমি ভাবি, আমি যেভাবে দেশের দুঃখ অনুভব করি তেমন ভাবে আর কেহ করে কিনা। আমি প্রত্যহ তিনখানা সংবাদপত্র আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিচলিত হই।''[৫৫]

সত্যিই তাই কেনারাম সংবাদপত্র মারফৎ দেশের দুরস্থার চিত্র প্রত্যক্ষ করে অস্থির হয়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে কাপের পর কাপ চা কফি শেষ করেন। অনাথ বালিকাকে দেখে তার মন দুঃখী হয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে অর্থ সাহায্য দেবার কথা মাথায় এলে তার মনে হয় :

> ''ভিক্ষা দিলে উহাকে অপমানই করা হইবে। বেচারী যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছে, আর কেন! পয়সা বাহির করা হইল না, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাইলাম না।''[৫৬]

মাংসের কোর্মা সহযোগে লুচি খেতে খেতে তার মনে হয় ''কত লোক যে অনাহারে আছে!'' অনাহারী মানুষের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হয় বালিশের ওপর রোমশ তোয়ালেখানা নেই। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি। অন্তর্বিলাপ করতে থাকেন :

> ''গৃহিণী সেকেন্ড শোয়ে সিনেমায় গিয়েছেন, আমার বালিশের ওপর তোয়ালে দেওয়া হইয়াছে কিনা দেখিবার অবসর পান নাই। এই দেশেই কি সীতা-সাবিত্রী ছিল? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া যে চাকরটিকে নিযুক্ত করিয়াছি সেও আমার বালিশের উপর তোয়ালেটি বিছাইয়া দিবার অবসর পায় নাই। খাদ্য মন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকি বাজ। এ দেশের কি কোন দিন উদ্ধার হইবে?''[৫৭]

এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে বনফুল দেশ দরদী কেনারামের দেশের প্রতি কৃত্রিম দরদের কথা তুলে ধরেছেন এবং প্রতিটি ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণের চূড়ান্ত অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। এরফলে সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরস, যা সম্পূর্ণরূপে বিদ্রূপাত্মক।

'অনির্বচনীয়' গল্পে যে দোজবর জয়ন্তবাবুর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবের কথা শুনে তার সঙ্গে বিবাহের ভয়ে ক্ষণিকা খাস্তগীর, ইংরেজীতে অনার্স, বি.এ আত্মহত্যার কথা ভাবছিল তাকেই বিবাহ করে তারই এক বান্ধবী সুজাতা এবং সেই বিবাহসূত্রেই জয়ন্তবাবুর সঙ্গে তার আলাপ। কিছুদিন পরে শোনা যায় ক্ষণিকা খাস্তগীর তাকে 'লভ ম্যারেজ' করেছেন। গল্পটিতে

হাস্যরসের কারণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ব। শিশু যখন খেতে চায় না তখন তারই সামনে তারই সমবয়সী কোন শিশু যখন এই খাবারই বেশ তৃপ্তি করে খায় তখন আর তার সহ্য হয় না তখন সে খাবারই প্রয়োজনে কেড়ে নিয়ে হলেও তার খেতে হবে। শিশুর এই মনস্তত্ব বড় হলেও মানুষের মধ্যে চিরকালীন প্রবৃত্তি হিসেবে থেকে যায়। বনফুল এই মনস্তত্বকেই আলোচ্য গল্পে হাস্যরসের উপাদান হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।

বনফুল তাঁর কিছু গল্পে গ্রাম বাংলার পল্লীসমাজের সংকীর্ণ জীবনের কিছু খন্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন। **'সনাতনপুরের অধীবাসী বৃন্দ'** এরকমই একটি গল্প। অপরের নামে মুখোরোচক কেচ্ছা, গুজব দলাদলি, ইত্যাদি নিয়ে পল্লীবাংলার মানুষ যে কতটা মাতোয়ারা তা স্পষ্ট হয়েছে এই গল্পটিতে। প্রবীন মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। এ নিয়েই তৈরী হয়েছে গ্রাম্যগুজব। গ্রামের প্রতিটি আনাচে কানাচে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে শৈলেশ্বর শ্যামা ধোপানীকে নিয়ে পালিয়েছেন। এ নিয়ে তৈরী হয়েছে দলাদলি। একদল শৈলেশ্বর-অনুগামী গোষ্ঠী, আর অন্য দল শৈলেশ্বর-বিরুদ্ধ গোষ্ঠী। প্রথম পক্ষ ভেতরে ভেতরে নিজেদের মধ্যে গুজবটিকে মেনে নিলেও বাইরে গুজবটিকে চাপা দিতে তারা মরিয়া। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে থাকে ''শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে।'' অথবা ''ছ্যা-ছ্যা! লোক হাসালে!'' কিন্তু বাইরে প্রচার করল ''শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন।'' অপর দিকে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীও বিপক্ষকে জব্দ করবার এমন সুযোগ হাত ছাড়া করতে নারাজ। তারা শৈলেশ্বর-শ্যামা প্রসঙ্গটি বেশ একটু রঙ চড়িয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন। শৈলেশ্বর-স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ পিত্রালয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গুজবটা এমন ভাবে রটেছিল যে সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল। ভীত চকিত শৈলেশ্বর-গৃহিণী বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসে এ কাহিনী শুনে স্বাভাবিক ভাবেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। পাড়ার অন্যান্য গৃহিণীরা তাকে সান্ত্বনা দিতে এল। সনাতন পুরে এ কাহিনি নিয়ে যখন ঘোর চাঞ্চল্য এমন সময় সমস্ত গুজবে জল ঢেলে ফিরে এল শ্যামা। সে জানাল যে সে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু অলস নিষ্কর্মা পুরুষের দল তখন আরেকটি গুজব ছড়ালো যে শ্যামার স্বামী পিরুধোপা টাকা খেয়েছে। এ গুজবও বেশিদিন চলল না। কারণ কিছু দিন পরে প্রকাশ পেল আসল সত্য। শৈলেশ্বরবাবু আর বেঁচে নেই। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কুয়ো ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে তিনি ঐ কুয়ায় পড়ে গিয়েছেন এবং সেখানেই চোট আঘাত পেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

একজন নিরপরাধ, প্রবীন ভদ্রলোকের চরিত্র নিয়ে গ্রাম বাঙলার পল্লীসমাজের একশ্রেণীর লোকের গুজব ছড়ানোর মানসিকতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ গল্পে। গল্পটি একদিকে যেমন ব্যঙ্গধর্মী অন্যদিকে হিউমারধর্মীও বটে।

'অতীতের রাণী' গল্পে এক বৃদ্ধ ভিখারিণীর 'দুদিন কিছু খাইনি বাবা দয়া করে কিছু দিন'—এই আর্ত ভিখারীকান্নার চিত্র অঙ্কণের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বহীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। একদিকে একজনের দুমুঠো খাবারের জন্য হাহাকার অন্য দিকে ঠিক তার পাশেই চলছে সুন্দরী নায়িকার বিজ্ঞাপন দিয়ে আকর্ষণীয় ছবি আর তা দেখতে প্রচুর মানুষের ভীড়। এক এক করে তার সামনে দিয়ে চলে যায় মুখ্যমন্ত্রীর মোটর, বিয়ের প্রশেসন, কিন্তু সকলেই নির্বিকার। এমনকি সর্বহারাদের বিরাট মিটিং-এও বুড়িকে দয়া করার কেউ নেই। বুড়ী ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সে ভিক্ষার বাটিটি ছুঁড়ে মারল পুলিশের মুখের দিকে। এরপর পুলিশের ব্যটনের একঘায়ে বুড়িও লুটিয়ে পড়ল। পুলিশের পা দুটি জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে :

''আমায় জেলে পুড়ে দাও সার্জেন্ট সাহেব। আমাকে জেলে পুড়ে দাও—যেখানে রোজ দুটি খেতে পাব। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—।''[৫৮]

বনফুল তাঁর 'বুড়িটা' গল্পে একজন শুকনো ডাল হাতে বুড়ির করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের অসহায় বৃদ্ধাদের একটি সামগ্রিক চিত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। **'ছুঁড়িটা'** গল্পে অনুরূপভাবে লেখক আমাদের দেশের পতিতা নারীদের পতিতা হয়ে ওঠার কাহিনি এবং তার পরিণতির করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ছুঁড়িটা মেয়েটির প্রকৃত নাম নয়, স্টেশনের টিকিট কালেক্টর বাবুদের দাওয়া নাম। তার আসল নাম ছিল অপ্সরী। স্কুলে ভালো মেয়ে হিসেবেই পরিচিত ছিল সে। কিন্তু ঝিগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি করে তার মায়ের পক্ষে তাকে বেশিদিন পড়াশুনা করানো সম্ভব হয়নি। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াশুনার পর হেডমিষ্ট্রেশ তার নামটা কেটে দিলেন। এরপর একদিকে অভাব, অন্য দিকে প্রলোভনের মধ্যে পরে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে। তারপর তার নিজের কথায় :

> ''মনে পড়ে একটি পশুত্বের হুল্লোড়ের মধ্যে দিনগুলি কেটে গেছে খালি। মাঝে মাঝে ভালো যে লাগেনি তা নয়, কিন্তু সবসময় ভালো লাগতো না। ভালো না লাগলেও ভালো লাগার ভান করতে হত।''[৫৯]

আর তার পরিণতি লেখকের কথায়, ''সবাই মিলে তাকে চুষে, চিবিয়ে ছিবড়ার মত ফেলে দিয়েছে রাস্তায় এখন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।''[৬০] এখন তার স্থান হয়েছে হাওড়া স্টেশনের গুড শেডের একধারে।

—রাজনৈতিক নেতাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যর দিকে বনফুল এখানে আলোকপাত করেছেন ছুঁড়িটার সূত্র ধরে। ছুঁড়িটার বাবা ছিলেন তার মায়ের এক খরিদ্দার। দিল্লী গিয়ে তিনি একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতায় পরিনত হন। তিনি আসছেন তাদেরই শহরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তার বক্তৃতা শুরু হবার আগে একজন এগিয়ে এসে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

''এঁর পরিচয় আপনারা সবাই জানেন। দেশের এই দুর্দিনে এর অমূল্য উপদেশ আমাদের পথ নির্দেশ করবে।''[৬১]—এখানেই রয়েছে শ্লেষ।

যাদের উপর ভরসা করে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তভাবে দিন যাপন করার স্বপ্ন দেখে তারাই যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন দেশ ও সমাজের অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। **'গহিন রাতে'** গল্পে লেখক তারই একটি বিদ্রূপাত্মক ছবি এঁকেছেন। গল্পের নায়ক পুরন্দর ট্রেন লেট হওয়াতে রাত বারোটায় হাটা পথে শ্বশুরবাড়ি রওনা দিয়েছেন। পথে ডাকাতদের হাতে তার সর্বস্ব খোঁয়া যায়। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে তিনি হতবাক হয়ে যান যখন তিনি দেখেন কিছুক্ষণ আগে তার ডাকাতি হয়ে যাওয়া জড়ি পেড়ে শান্তিপুরীখানা তার স্ত্রী তাকে এগিয়ে দিল। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। স্ত্রীর পরামর্শে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে পুরন্দর দেখল :

''দারোগাবাবুর হাতে যে রিষ্টওয়াচটি রহিয়াছে সেটি তাহারই। ব্যান্ডের উপর শখ করিয়া সে যে 'পি' অক্ষরটি লিখিয়াছিল সেটিও তার নজড়ে পরিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল বজ্র নির্ঘোষে চিৎকার করিয়া বলে—''ওরে হারামজাদা চোর'' কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল ধর্মাবতার!'' সে হাত জোড় করিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।''[৬২] বনফুল নিজে এই গল্পটি সম্পর্কে জানিয়েছেন যে এটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

'উৎসবের ইতিহাস' গল্পটি ভিন্ন রীতিতে রচিত। কাহিনির আগের কথাকে পরে ও পরের কথাকে আগে সাজানো হয়েছে এই গল্পে। প্রথমে বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করে অতীতে ফিরে গিয়েছেন গল্পকার। গল্প আরম্ভ হয়েছে একটি ভোজ বাড়ীর প্রসঙ্গ দিয়ে। ভোজের কারণ গল্পের নায়ক নরেন মল্লিকের চাকরী। সে প্রথম শ্রেণীর এম.এ। কিন্তু তিরিশ টাকা বেতনের চাকরী জোটাতে গিয়ে যে ধরাধরির কাহিনি লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত উপাদেয়। শুধু ধরাধরিতেই শেষ নয় তাকে এই চাকরীর বিনিময়ে একটি কুৎসিত কন্যার পানিগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে।

এই গল্পে গল্পকার একদিকে চাকরীর বাজারের আকাল, অন্য দিকে সুপারিশের ভিত্তিতে চাকরী পাওয়ার প্রবণতাকে হালকা কৌতুকের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট উপাদেয় করে তুলেছেন।

যৌবনের উদ্দামতা, যৌবনের সীমালঙ্ঘন, যৌবনের অত্যুচ্ছ্বাস ও বিড়ম্বনা—সব কিছুর প্রতিই শিল্পী বনফুলের দরদ ছিল আন্তরিক, অবশ্য তারও একটি মাপকাঠি ছিল। যখনই তা নির্দিষ্ট একটি মাপকাঠি অতিক্রম করে যায় তখনই বনফুল নির্মম আঘাত হানেন এই আচরণের প্রতি। অন্যথায় বনফুল তাকে হাল্কা হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দেন। **'প্রভু-ভৃত্য'** গল্পটি এরকমই একটি গল্প। গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়েছেন বলে প্রভুটি এখন একটি ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। ঘটনাচক্রে ভৃত্যটিও প্রোষিতপত্নীক অর্থাৎ তার স্ত্রীও গেছে পিত্রালয়ে। প্রোষিতপত্নীক ভৃত্য

প্রোষিতপত্নীক প্রভুর পাহারায় ব্যস্ত। এ ব্যবস্থায় প্রভুটির কিছুতে স্বস্তি হচ্ছে না কারণ ভৃত্যটি গৃহিণীপক্ষীয় অর্থাৎ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হলেই গৃহিণীর কাছে নালিশ জানানোর আশঙ্কা রয়েছে। সেই আশঙ্কাতেই হাসপাতালের নার্স রুবিকে রাতে খাওয়ানোর ইচ্ছা থাকলেও সেটা হয়ে উঠছে না। হঠাৎই সুযোগটা চলে এল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রভু দেখলেন : ''একটি কম বয়সী গোয়ালিনী রান্না ঘরের দাওয়ার উপর বসিয়া অরিন্দমকে দুধ মাপিয়া দিতেছে এবং অরিন্দম হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।''[৬৩] প্রভুর আকস্মিক আবির্ভাবে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে অরিন্দম বলল: ''বুড়োর দুধ আপনার খারাপ লেগেছিল বলে একে বহাল করেছি। কাল-ও এই-ই দুধ দিয়ে গিয়েছিল, আপনি তো ভালোই বললেন!'' কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন প্রভুটি তারপর গম্ভীরভাবে বললেন : ''দুধ একটু বেশি নে আজ। পুডিং বানাতে হবে। হাসপাতালের নার্স রুবি আজ রাত্রে খাবে এখানে।''[৬৪]

'খেঁকি' গল্পে একটি লোম ওঠা কুকুরের আকাশ কুসুম কল্পনার মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। কুকুরটির সর্বাঙ্গে ঘা, চোখে ভালো দেখতে পায় না। স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙ্গা নিয়ে অন্য কুকুরদের সঙ্গে মারামারি করে দিনাতিপাত করলেও তার কোন এক পূর্বপুরুষ বুল ডগ ছিলেন এই আত্মভাবনায় সে গর্বিত। এই ভেবেই সে সান্ত্বনা লাভ করে যে এরই প্রভাবে তার একদিন দুর্দিন ঘুচবে। ভগবান একদিন তার দিকে মুখ তুলে নিশ্চই চাইবেন। সত্যি সত্যি সে সুযোগ একদিন উপস্থিত হল। হঠাৎই সেদিন সকালে স্টেশনের পরিচিত কুলি মিঠ্ঠু তাকে বেধে নিয়ে চলল স্টেশন মাষ্টারের কামরায়। উদ্দেশ্য ট্রেনে যাওয়ার সময় এক সাহেবের Dog Box এ রাখা কুকুর হারিয়ে যাওয়ায় তারই পরিপূরক হিসেবে খেঁকিকে Dog Box এ ঢুকিয়ে দেওয়া। খেঁকি কিন্তু অন্যরকম ভাবছিল। নিজের মনেই সে আকাশ কুসুম কল্পনা করে নিয়েছিল। সে ভাবছিল :

> ''এতদিনে কি তাহার হুঁশ হইয়াছে যে আমার মতন এমন একটা বুলডগ বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মতো ঘুরিয়া বেড়ানোটা অশোভন? তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিযাত বংশীয় কুকুরদের মতো বাঁধিয়া খাওয়াইবে? জানি না, কি তাহার মনোভাব।''[৬৫]

কিন্তু মিঠ্ঠু তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে Dog Box-এ তুলে দিল। এরপর যা ঘটল তা কুকুরটির পক্ষে বড় করুণ :

> ''সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন।
>
> কুলি গিয়া সেলাম করিয়া বলিল—''হুজুর, কুত্তা লে আয়া।''

সাহেব বলিলেন—" What? What`s the joke?``

ক্ষীণ ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া প্রভুর দিকে চাহিতে যাইব, এমন সময় আমার মুখের উপরেই সজোরে সবুট পদাঘাত করিয়া সাহেব গর্জিয়া উঠিলেন—''লে যাও হিঁয়াসে—Station masterকো বোলাও।''[৬৬]

এ গল্পটিতে বিষয়বস্তু যতটা না হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে তার থেকে কুকুরটির আত্মজীবনীতে বসানো বনফুলের সৃষ্ট সংলাপ অনেক বেশী হাস্যরস জমিয়ে তুলেছে। ট্রেন ছাড়ার পর কুকুরটি তার আত্মজবানীতে বলেছে :

> ''চলিয়াছি। নব বধূ যেমন তার আজন্ম পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া অজানা-অচেনার উদ্দেশে আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেল-হৃদয়ে যাত্রা করে, আমিও তেমনি চলিয়াছি। জানি না আমার এই অজানা সাহেব মনিব কেমন লোক! যেমনই লোক হোক, সাহেবরা শুনিয়াছি ভালো কুকুরকে চেনে, যত্নও করে। তাই আমার আশা আছে যে বুল ডগ-পূর্ব পুরুষের আভিজাত্য সে আমার জীর্ণ অঙ্গেও খুঁজিয়া পাইবে।''[৬৭]

সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে সে ভেবেছে :

> ''বুঝিলাম, এই বার আমার সাহেব মনিবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে, মিলনলগ্ন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সহসা বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল—আশায় আনন্দে না ভয়ে, বলিতে পারি না।''[৬৮]

ঠিক এর পরেই তার ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎকার।

কুকুরটির এই করুণ পরিণতির পাশাপাশি গল্পকার আরেকটি দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। সেখানেও স্বপ্নভঙ্গের ছবি। কুকুরটি সাহেবের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন না করে এক ভদ্রলোকের আঙ্গিনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো। একটু পড়ে সে দেখল এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন বাড়িতে। সে তার স্ত্রীকে বলছে :

> ''চাকরী হল না, সাহেব বললে—ও post-এ বাঙ্গালী নেওয়া হবে না—সাহেবদের জন্য ওটা reserved. অমন চাকরী কি আর ভেতো বাঙ্গালীর অদৃষ্টে জোটে।'' [৬৯]

—দুটো ক্ষেত্রেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে এবং স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ এ দেশীয় ছাপ। একদিকে সাহেবদের সাহেব প্রীতি, অন্যদিকে দেশীয়দের তার স্বজাতির প্রতি ঘৃণাকেও বোধহয় দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার।

বনফুল কোন কোন ছোটগল্পে রূপক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেমন **'দুই রকম স্বাধীনতা'** গল্পটি। এখানে গল্পকার স্বাধীনতা ও বর্তমান শিক্ষা

পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। বহু রক্ত ঝরানোর পর যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার স্বরূপ গল্পকথকের সঙ্গে তারই বাগানের সদ্য ফুল ফোটানো লেডি হিলিংডন গাছের সঙ্গে কথোপকথনে উন্মোচিত হয়েছে। দুজনেই স্বাধীন অথচ গল্পকথকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু তারই বাগানের ছোট্ট লেডি হিলিংডনটি তো বেশ আছে। তাই তো সে বলতে পারে : ''স্বাধীনতা আপনার কষ্টের কারণ কি করে হল ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো স্বাধীন, আমার কোনও কষ্টই নেই।''[৭০] কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এরকম হল? আসলে একদিকে মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে গাদাগাদা ডিগ্রি অর্জন করে আর যাইহোক স্বনির্ভর হওয়া যায় না। এই সত্য কথাটি পাশের টবের একটি মৃত প্রায় ক্রিসানথিয়ামের মুখ থেকে গল্পকার কৌশলে আমাদের শুনিয়েছেন :

> ''লেডি হিলিংডন মাটিকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মালি জল না দিলেও ওর শিকর মাটির রস আহরণ করে নিতে পারে। আমি আছি টবে, তোমার মালি জল না দিলে আমি বাঁচতে পারি না। আমার শিকর টবের গায়ে আটকে যায়, মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তোমারও বন্ধু সেই অবস্থা। এক অদৃশ্য টবের উপর তুমি রয়েছ, বাইরে থেকে খাবার আসবে। তবে তুমি বাঁচবে। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আমরা উভয়েই সগোত্র। বাইরে থেকে রস এলে তবে আমরা ফুল ফোটাতে পারি। না এলে মরণ ছাড়া আমাদের গতি নেই। লেডি হিলিংডনের স্বাধীনতা আর তোমার আমার স্বাধীনতা এক নয়।''[৭১]

বনফুলের **'স্বাধীনতার জন্ম'** গল্পটিকেও রূপক গল্পের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। রূপকে স্পষ্টত একটি আখ্যান থাকে এবং তার সমান্তরালে বয়ে চলে আরেকটি আখ্যান। ডিমের ভিতরে ভ্রূণ স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীনতার। সে স্বপ্ন দেখে :

> ''আকাশে উড়িবে। আকাশ কি জানা ছিল না, কিন্তু আকাশের স্বপ্নটা ছিল, একটা দুর্দম প্রেরণা সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল অসীম শূন্যে। কিন্তু বাধা দুস্তর। একটা লালার সমুদ্রে সে হাবুডুবু খাইতেছে। সে সমুদ্রও সীমাবদ্ধ। ঊর্ধ্বে নিম্নে দক্ষিণে বামে কঠিন অস্বচ্ছ প্রাচীরের পরিবেষ্টনী। প্রাচীর অতিক্রম করিয়াও স্বাধীনতা নাই। আছে পালকের জঙ্গল। পক্ষীমাতার কুক্ষিগত সে। স্বাধীনতা কোথায়।''[৭২]

খুব অল্প সময়েই সে অনুধাবন করতে পারল যে তার স্বাধীনতা সহজ লভ্য নয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই মানুষের জঠরানলের কোপে পড়ে তার অপমৃত্যু ঘটেছে। তা সত্ত্বেও স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর ভাটা পড়েনি। ভ্রূণের এই আশঙ্কা আসলে প্রত্যেকটি পরাধীন ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা। তারা মনে মনে স্বপ্ন দেখে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার, কিন্তু আসলে

দুস্তর বাধা। মানুষের আগ্রাসন নীতির কাছে বারবার তারা ভোজ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এরপর বহু সংগ্রামের বিনিময়ে যখন স্বাধীনতা আসে তখন সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। এই অবস্থায় সত্যিই কি তার পক্ষে স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব। এই আশঙ্কাটিও রূপকের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় :

> ''পক্ষী শাবক বাহির হইয়া আসিল। কুৎসিত কদাকার। পালক নাই, রঙ নাই, সুর নাই, গান নাই। ধনীর প্রাসাদে নয়, অলঙ্কৃত টেবিলে নয়, মহার্ঘ প্লেটের উপরে নয়, অতি তুচ্ছ খড়-কুটার শয্যায় শুইয়া আছে। আশে পাশে দুলিতেছে কয়েকটা সবুজ ডাল, মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিতান্ত অসহায়। সর্প, শ্যেন, শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্য-অদৃশ্য শত্রু চতুর্দিকে। ও কি বাঁচিবে?''[৭৩]

কিন্তু বনফুলের স্থির বিশ্বাস :

> ''মৃত্যুহীন স্বপ্নের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি
> ওই একদিন আকাশে উড়িবে।'' নিশ্চয় বাঁচিবে। ওই একদিন আকাশে উড়িবে।''[৭৪]

পুরুষদের কামপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ করে বনফুল কিছু কিছু গল্প লিখেছিলেন। এই ধরনের তিনটি গল্প **'অদ্বিতীয়া', 'অলকানন্দা' ও 'ট্রেনে'।** এই গল্পগুলির মধ্যে **'অদ্বিতীয়া'** বনফুলের একটি অসাধারণ সৃষ্টি। হাস্যরসে ভরপুর এই গল্পটি। সঙ্গে রয়েছে ব্যঙ্গ। এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে পুরুষদের বারবার বিবাহ প্রবণতাকে। আবেগ, প্রেম-ভালোবাসাকে ছাপিয়ে এখানে বড় হয়ে উঠেছে ফ্রয়েডের তত্ত্ব। গল্পের নায়কের স্ত্রী প্রভাবতী গড়ে বছরে দেরটি সন্তান প্রসব করে চার বছরেই ছয়টি পুত্র কন্যার মালিক হয়েছিলেন। এবং আরেকটি সন্তান জন্ম দিতে চলেছেন। সন্তানের জন্ম দিতে সে বাপের বাড়িতে আসে। সে জানে তার স্বামী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, স্বামীর কাছে সে সত্যিই অদ্বিতীয়া। সে বিশ্বাস করে সন্তান প্রসবের সময় সে মরে গেলে তার স্বামীর ভীষণ কষ্ট হবে। এই নিয়ে দিদির সঙ্গে সে বাজিও ধরেছিল। বাজির কথা প্রমাণ করতে গিয়ে দিদি তার বোনের বরকে ফোন করে জানাল যে সন্তান প্রসবের সময় তার স্ত্রী মারা গেছে। ঘটনাচক্রে ছুটি না পাওয়ায় সে যেতেও পারলো না। এরপর মাস দুয়েক পর সে তার বোনের বরকে যে চিঠিটি লেখে তার বয়ান এরকম :

> ''প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে, জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা তো ভালো দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোন। আবার বিয়ে কর তুমি।....এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বল, সম্বন্ধ করি। আমার তো মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চই পছন্দ হবে।''[৭৫]

এই চিঠিটির উত্তরে গল্পকথক যে চিঠিটি লেখেন তার বয়ান এরূপ :

> ''বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে তো সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা ''মা ফলেষু কদাচন'' দেশের লোক! আর তোমরাও যখন বলছ, তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টা করাই উচিত বোধহয়।''[৭৬]

এ গল্পের হাস্যরসের মূল আধার গল্পকথক নিজেই। তার সংযমের কোন বালাই নেই। না আছে দৈহিক সংযম, না আছে মানসিক সংযম। চার বছরে যে ছয়টি সন্তানের পিতা হতে পারে তার দৈহিক সংযম নিয়ে মন্তব্য না করাই ভাল। আর স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র দুমাসের মধ্যে আবার বিবাহের সিদ্ধান্ত এবং তার বিবাহের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তি হিসাবে বড় বড় কথার আবতারণা পাঠক কে না হাসিয়ে পারে না। এরপর যখন গল্পকথক গোফ কামিয়ে সত্যি সত্যি বিয়ে করতে যায় তখন বিবাহ সভায় ছদ্মবেশী কনের ক্রিয়াকলাপ এবং ফুলশয্যার রাত্রে বুকে অনেক আশা ও আশঙ্কা নিয়ে বরের ঘরে ঢোকা এবং তার নিজেরই ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু নিয়ে স্বয়ং প্রভাকে খাটে বসে থাকতে দেখে তার স্বপ্ন ভঙ্গের দৃশ্যে পাঠক অনাবিল হাস্যরসের স্রোতে গা ভাসায়। কিন্তু হাসতে হাসতে বেশী দূর এগোতে পারে না পাঠক, হাসি তাকে থামাতে হয় কারণ তার স্ত্রী প্রভার কথা মনে পড়ে যায় পাঠকের। সত্যিই প্রভার জন্য সমব্যথী না হয়ে পারা যায় না। এতো তার বিশ্বাসের অপমৃত্যু, প্রেম ভালোবাসার অপমৃত্যু। সুতরাং এ গল্পে হাস্যরসের পরিণতিতে করূণরসের অবতারণার মধ্য দিয়ে যে রসের সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে হিউমারধর্মী।

নারীর সম্মোহিনী শক্তির মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন চিহ্নের কোন অবকাশ নেই। যুগে যুগে মানুষ এমনকি দেবতারাও হার মেনেছেন নারীর সম্মোহিনী শক্তির কাছে। **'অলকানন্দা'** গল্পেও এই নারী সম্মোহিনী শক্তির মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। 'অলকানন্দা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা উপলক্ষে বিভিন্ন লেখকেরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের লেখা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। পত্রিকাটির প্রকাশের যাবতীয় খরচ ধনেশবাবুর দেওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল ধনেশ পত্রিকা প্রকাশের জন্য এক পয়সাও খরচ করবেন না। এর ফলে সকলেই লেখনী বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু দিগিন্দ্র সোম হাল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি নানা উপায়ে ধনেশবাবুকে পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় খরচ জোগানোর জন্য রাজী করাতে সচেষ্ট হলেন। ধনেশের পিতা, ধনেশের গুরু

সকলেরই কাছে ধনেশকে বোঝানোর আর্জি নিয়ে তারা গেলেন। কিন্তু কোথাও সুবিধে হল না। অবশেষে তারা চিৎপুর অঞ্চলের এক সুন্দরী যুবতীর শরণাপন্ন হলেন। ''বলা বাহুল্য, ধনেশ পুরুষ মানুষ। সুতরাং সে কাবু হইল।'' ধনেশের এই কাবু হওয়া তো পুরুষদের চিরকালীন কামপ্রবণতার কাছেই কাবু হওয়া। পুরুষদের এই কামপ্রবণতাকেই বনফুল এই গল্পে কটাক্ষ করেছেন। এ ছাড়া এই গল্পে রয়েছে আরও একটি শ্রেণীর মানুষের প্রতিরূপ যারা নিজের ক্ষমতা থাক আর না থাক ছলেবলে কৌশলে ধনী হতে আগ্রহী। দিগিন্দ্র ও তার সঙ্গীরা, প্রকৃতিগতভাবে কেউ বিজ্ঞানী, কেউ কবিরাজ, কেউ বা ব্যায়ামবীর হলেও শুধু টাকা উপার্জনের লোভে সাহিত্যিক হতে প্রস্তুত। এই ধরণের মানসিকতাকেও কটাক্ষ করেছেন বনফুল এই গল্পে।

'ট্রেনে' গল্পে দানাপুরগামী ট্রেনে এক বৃদ্ধ বসে আছেন বৃদ্ধ হলেও লোকটি যে এক কালে শৌখিন ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। হাতে একটি মোটা বর্মা চুরুট। খবরের কাগজে নিবদ্ধ দৃষ্টি। পরের স্টেশনে বছর উনিশ কুরির একটি যুবক উঠল। তারও গন্তব্যস্থল দানাপুর। যুবকটির চালচলনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রচন্ড অসন্তুষ্ট হলেন। যুবকটি গায়ে পরে আলাপ করতে এলে সে আরও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বাদেই বৃদ্ধের হাতের খবরের কাগজটাও চেয়ে নিল সে। খবরের কাগজের একটি খবরকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে শুরু হল প্রচন্ড ভাব। তারপর বৃদ্ধও ছেলেটির হাতে থাকা মাসিক পত্রিকাটি চেয়ে নিলেন। সেখানে ছিল একটি গল্প। সেই গল্পকে কেন্দ্র করে মেয়ে মানুষ নিয়ে শুরু হল তাদের কথোপকথন। বৃদ্ধ আরম্ভ করলেন তার ছেলে বেলার কাহিনি :

> ''সৈরভী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল। তার গর্ভে একটি ছেলে হল। ছেলেটা মাস দুয়েকের, তখন বাস্, মাগী একদিন উধাও। শুনলাম তিনি রামেশ্বরপুরের জমিদারের প্রেমে পড়েছেন। আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মাথাই ঘামালাম না। ''I had an other—girl`s were so cheap in those days!''[৭৭]

সৈরভী এবং রামেশ্বরপুরের জমিদার বাড়ীর চাকরাণীর কথা শুনে যুবকটি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বিনীত ভাবে বললে : ''সৈরভী আমারই মা। তিনি এখনও রামেশ্বরপুরের জমিদার বাড়িতে চাকরাণী আছেন। আপনি আমার বাবা।''[৭৮]

তারপর হঠাৎ সে বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইল যে তার নাম হারাধন বসাক কিনা! কিন্তু বৃদ্ধ উত্তর দিল তার নাম রমেশ সেন। যুবটি বললেন :

> ''ও, যাক। তবে আপনি নন। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বসাক। তা হলে আপনার একটা চুরুট দিন স্যার। আমার বিড়ি গেছে ফুড়িয়ে। বাঁচালেন আপনি।''[৭৯]

উনিশ কুড়ি বছরের এক শ্রেণীর ছেলেদের বড়োদের প্রতি অশ্রদ্ধার মনোভাবকে যেমন একদিকে এ গল্পে দেখানো হয়েছে তেমনি আরেক দিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে শুভ্র বেশধারী বৃদ্ধের কলঙ্কময় চারিত্রিক নীচতাকে। গল্প যত এগিয়েছে বৃদ্ধের ব্যক্তিত্বের আবরণটি ক্রমশ আলগা হয়ে গেছে। এবং তা চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছে চুরুট ধরাতে গিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটি থেকে চুরুট ধরানোর মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধের আচরণের সঙ্গতিহীনতাই গল্পটিকে কৌতুকময় করে তুলেছে। একদিকে অসঙ্গতি অন্যদিকে চমক এ গল্পে কৌতুকের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। চমক সৃষ্টি হয়েছে যখন যুবকটি সেই বৃদ্ধকে নিশ্চিতভাবে নিজের বাবা বলে ধরে নেওয়ার পর হঠাৎ করে যখন জানতে চায় তার নাম হারাধন বসাক কিনা? কিন্তু জানা যায় তার নাম রমেশ সেন। অর্থাৎ এখান থেকে পরিস্কার যে যুবকটির মায়ের সেই বৃদ্ধের পরে আরেকজনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এবং সেই বিবাহও টেকেনি।

'উচিত-অনুচিত' গল্পটি ব্যঙ্গাশ্রিত। উচিত-অনুচিতের মাপকাঠি কীভাবে অন্যের ক্ষেত্রে একরকম হলেও নিজের ক্ষেত্রে পাল্টে যায় তা মৃদু কটাক্ষের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে। গল্পকথক অশোক ও শফরীর বিয়েতে তাদের বাবা-মায়ের আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পান না। কিন্তু তাদের দুপক্ষের বাবা-মায়েরাই নিজেদের সন্তানদের উচ্চ মূল্য সম্পর্কে নি:সন্দেহ হয়ে ঐ বিয়েতে আপত্তি জানায়। যদিও সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে অশোক ও শফরী নিজেরাই পালিয়ে বিয়ে করে নেয়। এরপর দীর্ঘ ২০ বছর পরে হঠাৎ করেই একদিন অশোক ও শফরী গল্পকথকের বাড়ি আসে তাদের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে গল্পকথকের ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। অশোক ও সফরী সমাজে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত হলেও এবং বিয়েতে আপত্তি করবার মতো কিছু না থাকলেও গল্পকথক কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারেননি।

'জাগ্রত দেবতা' গল্পে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে দেবদেবীর প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে কটাক্ষ করা হয়েছে। সনাতনপুর গ্রামে মহাদেব অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে সকলের কাছে পরিচিত। তারা বিশ্বাস করে বিপিন চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে মুকুজ্যে, ঘোষাল প্রভৃতি গ্রামের সকলেরই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এই মহাদেবের কৃপায়। সারাবছর মহাদেবের থান নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা না থাকলেও বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই মহাদেবকে কেন্দ্র করে প্রকান্ড উৎসব হয়। সকলেই জানে সেদিন আরেকটি ঘটনাও ঘটে। মহাদেবের মাহাত্ম্যে সেদিন একজন লোক পাগল হয়ে যায়। সেবছরও নির্ধারিত দিনে মহাদেবের উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। সব কিছু ঘটল স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সে বছর কেউ পাগল হল না, অন্তত এরকম কোন খবর কেউ দিতে পারলো না। এ ঘটনা সনাতন পুরের গ্রামবাসীর কাছে

অবিশ্বাস্য। তারা সকলেই ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কা করতে লাগলো। কেবল বিশ্বাস হারালো না প্রবীন নীলমণি।

''তাঁহার বিশ্বাস, কেহ-না-কেহ নিশ্চয় পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপুরের বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে? হইতেই পারে না।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা! ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হবে।

সনাতনপুরবাসীগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।''[৮০]

—অন্ধবিশ্বাস কীভাবে মানুষের সুস্থ মস্তিষ্ককে বিপর্যস্ত করে দেয় তার বড় প্রমান এই গল্পটি।

'প্রমাণ' গল্পে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের অবিশ্বাস ও সন্দেহপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রবীণ ডাক্তার ঘনশ্যাম সেন ছোট মাছ খেয়ে তার গলায় কাটা ফোটার কারণে চিকিৎসা করাতে হাজির হয়েছেন তারই বন্ধু ডাক্তার হাজরার কাছে। এমনিতে ডাক্তার সেন ছোট মাছ খান না। কিন্তু বাজারের মেছুনির কাছে বড় মাছ বলতে ছিল আড় ও চিতল। ডাক্তারবাবুর বাত আছে জেনে মেছুনিটি তাকে সেই মাছ দেননি। কারণ বাতের রোগীদের এই মাছগুলি খাওয়া বারণ। তাই সে অন্য দোকান থেকে তাকে ছোট মাছ এনে দিয়েছে। আর তাই খেয়েই ডাক্তারের এই বিপত্তি। ডাক্তার হাজরা সব শুনে বললেন মেছুনিটা আসলে ধূর্ত। তাই তার পঁচা বড় মাছগুলি ডাক্তারবাবুকে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে চাননি। কিন্তু ডাক্তার সেন তাকে হিতৈষী বলে মনে করেন। হাজরা যুক্তি দিয়ে বোঝান :

''আই ডোন্ট থিংক সো। যারা সুযোগ পেলেই ওজনে কম দেয়, পচা মাছ বিক্রি করে, চোরা বাজারের অলিতে-গলিতে যাদের হরদম আনাগোনা, তারা যে হঠাৎ এমন উদার হিতৈষী হয়ে উঠবে তা ভাবা শক্ত।''[৮১]

প্রমান পাওয়া গেল পরমুহূর্তেই। ডাক্তার সেনকে খুঁজতে খুঁজতে সেই মেছুনী হাজির হল সেখানে। সে তার নিজের ভাষায় ডাক্তারকে যা বলল তার সারমর্ম হল :

''বেটা বুঝতে পারছি আজ তোর খাওয়া হয়নি। এবেলা বড় রুই মাছ এসেছিল বাজারে। খুব টাটকা। তোর জন্যে তাই নিয়ে এলাম এক সের। তোর দাবাখানায় গিয়ে শুনলাম, তুই এখানে—তাই এখানেই নিয়ে এলাম—''

ডাক্তারবাবু তাকে দামের কথা জিজ্ঞেস করলে মেছুনি সবিনয়ে তাকে জানাল : ''দামের কথা পরে হবে—''[৮২]

'সাধু' গল্পে বনফুল দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষ হুজুগের বশে একজন সাধারণ মানুষকেও সাধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে। মানুষটির কোনও সংসার ছিল না। তাই লোকে তাকে সাধু বলত। তা ছাড়া সাধুত্বের আর কোন পরিচয় তার ছিল না। অথচ জীবু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাতারাতি তাকে একজন সাধু হিসেবে প্রতিপন্ন করে ফেলল। ঘটনাচক্রে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে নিউমোনিয়ার রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন। যদিও সাধুর পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়ার আগে ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়েছেন। তবু রোগী ও রোগীর পরিবার দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করলো যে এর পেছনে সাধুর মহিমা ছাড়া আর অন্য কোন মহিমা নেই। সাধুর পদধূলি নেওয়ার জন্য হাজির হল গ্রামের সকলে। সকলেরই ধারণা হল এ সাধু যেমন তেমন সাধু নয়, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক বিরাট পুরুষ। সাধু সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে এর মধ্যে কোন অলৌকিকতা নেই। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলো না। অগত্যা সেখান থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচলেন। ভারতবাসীর সাধুপ্রীতি এবং ধর্মকে সামনে রেখে রোজগারের ফন্দীকে বনফুল জীবু চরিত্রের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করেছেন এ গল্পে।

মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মানুষদের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে **'দুই খেয়া'** গল্পে। পাড়াগাঁয়ের দুই বন্ধু উমেশ ও নবীন একই সঙ্গে ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রওনা দিতে গিয়ে দেখে খেয়ার শেষ নৌকা চলে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। অথচ তাদের সেদিনই যেতে হবে। কেননা ঠিক তার পরের দিনই তাদের ভর্তি হতে হবে। কিন্তু কেমন করে তারা যাবে? হঠাৎ করে তাদের নজরে পড়ে একটু দূরে একটি নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে মাঝি জানায় যে কোনও এক দারোগা সাহেবকে নিয়ে যাবার জন্য ওপারের এক জমিদার নৌকা পাঠিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উমেশ নিজেকে সেই দারোগা বলে পরিচয় দেয় এবং নৌকায় উঠে পরে। কিন্তু নবীন নাছোড়বান্দা। মিথ্যার আশ্রয় সে নেবে না। ফলস্বরূপ তার আর ডাক্তারি পড়তে যাওয়া হয় না। পঁচিশ বছর পর দেখা যায় সেই উমেশ এখন মেজর ইউ.সি.চ্যান্ডা। যার কথাবার্তায় প্রকাশ পায় দেমাক এবং কথায় কথায় যার পয়সার অহঙ্কার। ফলস্বরূপ অসময়ে নিজের গায়ের মাঝিও তাকে পার করতে রাজী হয় না। অথচ সে মাঝিই অপেক্ষা করতে থাকে নবীনের জন্য নবীন তাকে কিছু না বলা সত্ত্বেও। লেখক জানিয়েছেন : ''নবীন ডাক্তার হতে পারেনি। হয়েছিল দেশ-সেবক।'' [৮৩] মিথ্যাশ্রয়ী মানুষদের এভাবেই কটাক্ষ করেছেন এ গল্পে।

ডাক্তারি অভিজ্ঞতা নির্ভর **'অনুবীক্ষণ'** গল্পটি বনফুলের ব্যঙ্গরসের গল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সামজিক পর্যবেক্ষণ খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে গল্পটিতে। গল্পকথক

রক্ত পরীক্ষা করতে বসে যে লোকটার কদর্য চেহারা, মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, ত্রি সন্ধ্যা, সদা-সঙ্কুচিত ভাব, ইংরেজি জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি দেখে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তাঁর ঠোঁটের ঘায়ের কারণ সিফিলিস ছাড়া অন্য কিছু নয়। রক্ত পরীক্ষায় কিন্তু তার কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ যে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে গল্প কথক মুগ্ধ হয়ে গেলেন, সক্রেটিস থেকে শুরু করে স্ট্যালিন পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের ইতিহাস যার কণ্ঠস্থ, ভারতবর্ষেরও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ যার নখদর্পণে, ব্রহ্মচর্যের পথকেই যিনি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করেন রক্ত পরীক্ষায় তার রক্তেই পাওয়া গেল সিফিলিসের জীবানু। গল্পকথকের ডাক্তার বন্ধু সব শুনে বললেন : ''তাই তো প্রত্যাশা করেছিলাম। বিলিতি এডুকেশনের মজাই ওই! এম.এ.ডি.লিট—প্রচন্ড বিদ্বান!''[৮৪] বিলিতি এডুকেশনে শিক্ষিত ভদ্রতার মুখোশধারী মানুষগুলিকে বনফুল এ গল্পে বিদ্রূপ করেছেন।

'অভিজ্ঞতা' গল্পে মানুষের অহংবোধকে ব্যঙ্গ করে গল্পটি রচিত হলেও গল্পটি শেষপর্যন্ত করুণরসে আদ্র হয়ে উঠেছে। গল্পকথক দুজন টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগীর পিতাদের আচরণে বিস্মিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার, অন্যজন গোবেচারী ভালো মানুষ ধরণের অতিশয় ভদ্রলোক। যিনি ডাক্তার তার প্রতিটি কথাবার্তায় রয়েছে অহংবোধের প্রকাশ। আর কথায় কথায় আফশোস করেছেন কলকাতায় ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ করতে না পারার জন্য। রোগীর সামান্যতম অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন ডাক্তারকে। রোগীর মায়ের আচরণও তদরূপ। কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত ছেলেটি বাঁচলো না। বাবা মায়ের কাছ থেকে শুধুই হতাশার বাণী শুনতে শুনতে মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটি পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। গল্পকথক জানিয়েছেন :

> ''ছেলেটির মা মাথায় শিয়রে বসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া মৃত্যুপথযাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাসবাক্যও বর্ষিত হইলনা! যতক্ষণ বসিয়াছিলেন কেবল হাহাকার করিতেছিলেন।
>
> ''এমন বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনিরে বাবা...''
>
> একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্তনাদ।
>
> তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়া গেল না। আমিই যেন অপরাধী।''[৮৫]

এর পাশাপাশি গল্পকথক আরেকজন যে রোগীর কথা উল্লেখ করেছেন সেও বাঁচেনি। কিন্তু তার পিতার আচরণ গল্প কথককে মুগ্ধ করেছে। নার্সের কাছ থেকে খারাপ খবর পেয়ে দ্রুত ছেলেটির কাছে পৌঁছান তিনি। এরপর গলপকথক জানিয়েছেন :

'' গিয়া দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন। মাথার শিয়রে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিলেন, ''আসুন, ডাক্তার বাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন...আশীর্বাদ করুণ ওর সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয় এইবার...সব গ্লানি যেন মুছে যায়...''

আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

''আসুন...''

আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, ''ইতস্তত করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলিই তো দরকার এ সময়ে। নিন... জুতো খুলুন...দিন... বেশ ভালো করে মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায়।

...আসুন—''

তাহার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, '' কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেয় দিয়ে দাও...''[৮৬]

হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ এক হাজার টাকা হাসপাতালে দান করে গেলেন। চেক ভাঙাতে গিয়ে গল্পকথক আবিষ্কার করলেন সেই বৃদ্ধ যেমন তেমন লোক নন, একজন বিলাতী ডিগ্রিধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন। অথচ তার আচরণে একটিবারের জন্য কোথাও বুঝতে দেননি তিনি একজন অত বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তার। প্রথমে উল্লিখিত অল্পজ্ঞানী ডাক্তারের উন্নাসিকতাবোধকে ও অহংবোধকে এভাবেই বনফুল এ গল্পে বিদ্রূপ করেছেন। করুণরসের আবহে গল্পটি শেষ পর্যন্ত বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠেছে।

'দুধের দাম' গল্পে বনফুল মানুষের মনুষ্যত্ববোধহীনতাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন একজন ট্রেনযাত্রী বৃদ্ধাকে সামনে রেখে। মানুষগুলো এতটাই মনুষ্যত্ববোধহীন যে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এত মানুষের মধ্যেও একজন বৃদ্ধা যখন পড়ে যান তখন সেদিকে কেউ লক্ষ করতে পারেন না। আর যাঁর হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকে বুড়ি পড়ে যান, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক হলেও বৃদ্ধের প্রতি তার কোনও করুণা হয় না। উল্টে বৃদ্ধাকে সধমক উপদেশ দেন : ''পথ দেখে চলতে পার না? আর একটু হলে আমার ষ্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে।'' এরপর ট্রেন এলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতিকষ্টে ট্রেনে চাপলেও কেউ এই বৃদ্ধাকে একটু সহায়তা করার জন্য

এগিয়ে আসে না। যে যার মত পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও বৃদ্ধাকে কেউ একটু করুণা করে বসার সুযোগ করে দেয় না। বৃদ্ধার কাছে বৈধ টিকিট থাকা সত্ত্বেও সকলেই মনে করে যে সে বিনা টিকিটের যাত্রী। এরপর ট্রেন থেকে নামার সময় পায়ের ব্যথায় কাতর বৃদ্ধা নামতে একটু সহযোগিতা করার জন্য সকলকেই কাতর অনুরোধ করলেও কেউ সেদিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে না। উল্টে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয় : ''ভিখিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে তো উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—''।[৮৭] অবশেষে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে একজন কুলি। তিনিই বৃদ্ধাকে অতি যত্নে কোলে করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন এবং গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য পরবর্তী ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন।

বনফুল এ গল্পে বাঙ্গালীর বাবুয়ানার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন। তারা সাহেবী পোশাক পরে যতই সভ্য হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন তা যে মুখোশমাত্র ভেতরে রয়েছে চূড়ান্ত বর্বরতা সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন বনফুল এ গল্পে। তাই শ্বেতবর্ণ সাহেব ফার্স্ট ক্লাসে সাহেবী পোশাক পরে বাবু হয়ে বসে থাকা বঙ্গসুন্দরদের যখন বর্বর বলে ব্যঙ্গ করে তাদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে দেন তখন বৃদ্ধা মনে মনে বলেন : ''তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যলরি অবশ্যই আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।''[৮৮]

'নদী' গল্পে গল্পকথকের বাল্যবন্ধুর মেয়ে আদরিণী দেখতে শুনতে যথেষ্ট সুন্দর এবং প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরও তার বিয়ের পাত্র জোটে না শুধুমাত্র গরীব হওয়ার কারণে। পাত্রের পিতাদের সকলেরই মূল দাবী মোটা অঙ্কের পণ। পাত্রের বাবারা যখন বুঝতে পারে যে মোটা অঙ্কের পণ এ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয় তখন তারা বিভিন্ন অজুহাতে এ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করে। বনফুল বিবাহ উপলক্ষে মানুষের এই প্রচ্ছন্ন লোভকে কটাক্ষ করেছেন 'নদী' গল্পে। আদরিণীর বিবাহ অবশ্য আটকায়নি। হিন্দু সমাজের মানুষের এই প্রচ্ছন্ন লোভে বিরক্ত হয়ে সে বিবাহ করেছে এক মুসলমান ছেলেকে। এবং বিবাহের পর সে সগর্বে গল্পকথককে বলতে পেরেছে :

> ''আমি মুসলমানকে বিয়ে করেছি। আপনাদের সমাজে তো ঠাঁই পেলাম না। এরা আমাকে আদর করে নিয়েছে, আদর করে রেখেছে, আমি সুখে আছি।''[৮৯]

আদরিণীর এই উক্তি তো প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে মস্ত বড় এক প্রতিবাদ।

পান্ডিত্যের প্রকাশ উপযুক্ত স্থান কাল পাত্রের অভাবে কতটা হাস্যকর হয়ে ওঠে **'একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'** গল্পে তা অত্যন্ত সরসভাবে বিবৃত হয়েছে। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে

আয়োজিত শহরের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ইতিহাসের একজন প্রকান্ড পন্ডিত। বিভিন্ন চটকদার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সভাপতির ভাষণ শুরু হল। চোখবুজে বক্তৃতা করা তার অভ্যাস। এখানেও চোখ বুজে তিনি একটি দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করতে লাগলেন। তিনি বলেই যাচ্ছিলেন ক্রমাগত। অবশেষে গল্পকথকের অনুরোধে তিনি যখন বক্তব্য শেষ করলেন তখন চোখ খুলে তিনি দেখলেন হলঘরে কেউ নেই কেবল তিনি একা।

সমাজের গভীরতর স্তরে বনফুলের দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল। তাই **'মালিয়া'** গল্পে একটি সদ্যবিকশিতযৌবনা মেয়ে মালিয়া কীভাবে সমাজেরই চাপে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবৃত করেছেন বনফুল। মালিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর সকৌতুক মন্তব্য :

> ''তারপরদিন পোষ্টমর্টেমও হল তার যৌবন পুষ্পিত দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে আইন নির্ণয় করবার চেষ্টা করলে মৃত্যুর প্রকৃত কারন কি। সমাজের যে স্তরে সে কারণটা নিহিত সেখানে ডাক্তারদের ছুঁরি পৌঁছায় না।''[৯০]

বনফুলের অনেকগুলি গল্পের বিষয় স্বাধীনতা। আসলে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে বনফুল বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন। একইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতা ও পরাধীনতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। পরাধীনতার যন্ত্রণা তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন আবার স্বাধীনতা পেয়ে দেশের মানুষের কীর্তিকলাপ দেখে আশাহত হয়েছেন। **'মুগুর'** গল্পটিতে বনফুলের সেই আশাভঙ্গের যন্ত্রণা ধরা পড়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ দেশের নাগরিকদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। ব্ল্যাকমার্কেট কালোবাজারিতে ছেয়ে গেছে দেশ। সাধারণ মানুষের চাকরি নেই। ঘুষ ছাড়া চাকরী হয় না। মাশল পাওয়ার হয়েছে দেশের নিয়ামক শক্তি। যার হাতে মাশল পাওয়ার আছে তার কোন অসুবিধা নেই এ দেশে। তাই সাধারণ মানুষ রামগুরু যখন ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসার ওষুধ জোগার করতে পারে না পয়সার অভাবে তখন তার বন্ধু পঞ্চানন মুহূর্তেই ওষুধ জোগার করে নিয়ে আসে শুধুমাত্র মাশল পাওয়ারের জোরে। শুধু ওষুধ নয় একবস্তা গোবিন্দভোগ চাল আর একটা বড় রুইমাছও তার বাড়িতে দিয়ে যায় সে। রামগুরু যখন জানতে চায় কীভাবে সে এগুলো জোগার করলো তখন পঞ্চানন জানায় :

> ''ওরা আমার বাধ্য লোক! ওদের আমরা রক্ষা করি। আমরা না থাকলে ওদের গুদাম ওদের ভেড়ী লুট হয়ে যেত। আমরাই বাঁচাই ওদের। তাই ওরা আমাদের খাতির করে, ভয়ও করে, যখন যা চাই দেয়। ভাই রে, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। সোজা আঙুলে কোনও ঘিই বেরোয় না এখানে। বার বার আঙুল

বেঁকাতে হয়। যাই হোক, তোর কোনও ভাবনা নেই। আমি আসব মাঝে মাঝে, তুই পুরনো দোস্ত, সব ঠিক করে দেব তোর।''

''আচ্ছা তুই কি করিস বল তো?'

''বলেছি তো আমি স্বাধীন দেশের মানুষ। কেউ বলে মস্তান, কেউ বলে গুন্ডা—''[৯১]

বনফুল এভাবেই **'মুগুর'** গল্পে স্বাধীন দেশের বাস্তব অবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন।

'বিশু আর ননী' গল্পে রয়েছে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি বনফুলের বিদ্রূপ। এদেশে গরীব লোকেদের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা সরকারী হাসপাতাল। অথচ সরকারি হাসপাতাল গরীব লোকেদের চিকিৎসার জন্য নয়। তাই গ্রাম থেকে পনেরো ক্রোশ দূরে দশবছরের ছেলেকে কোলে করে নিয়ে গিয়েও বিশু চাষার মত গরীব মানুষেরা সেখানে চিকিৎসা পায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করে যাও বা ডাক্তারের নাগাল পাওয়া যায় কিন্তু বেডের অভাবে সেখানে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। অবশ্য পঁচিশ টাকা ঘুষ দিলে যে বেড পাওয়া যায় সে কথাও কোন এক দালাল এসে জানিয়ে যায়। কিন্তু বিশুর মত গরীব মানুষদের পঁচিশ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং বিশুর ছেলের চিকিৎসা হয় না। এরপর অনেক কান্নাকাটির পর যাও বা হাসপাতালের একধারে মাটিতে শুয়ে থাকার অনুমতি মেলে কিন্তু তাতে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। কেননা একজন লোক এসে বিশুকে জানিয়ে যায় ''বিনি পয়সায় চিকিৎসা হয় না। পয়সা দাও কিছু কম্পাউন্ডারকে—''। কিন্তু বিশু টাকা দিতে পারে না। সুতরাং তার ছেলের চিকিৎসাও হয় না। ছেলের চিকিৎসার জন্য বিশুর করুণ আর্তনাদ কোন কিছুই কারো মন গলাতে পারে না। এভাবেই দেশের গরীব মানুষেরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ আয়োজন বেশ বড় মাপের সেখানে। ''সত্যিই বড় হাসপাতাল। বড় বড় থাম—সারি সারি বাড়ি। গিজ গিজ করছে লোক।''[৯২] এভাবেই বনফুল দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করেছেন এ গল্পে।

'সেকালের রায়বাহাদুর' গল্পটিও ব্যঙ্গপ্রধান। এ গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে এক বিশেষ শ্রেণীর ভারতবাসীর মানসিকতাকে। একদিকে ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ বলি দিচ্ছে অন্যদিকে ভারতবাসীরই কিছু অংশ তলে তলে ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করছে, ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুগত্য করছে। একদিকে দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা প্রেমীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে এই ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুগত্যকারী রায়বাহাদুর ভাবছে :

''—লুঠতরাজ করিলে আমরা স্বাধীন হইব? রেল-ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস পোড়াইয়া দিলেই স্বরাজ হইবে? টেলিগ্রাফের তার কাটিলেই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য পঙ্গু হইয়া যাইবে? ইহারা ক্ষ্যাপা, না পাগল!

যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ইহাদের দৌলতেই যাইবে। ইতিহাসের নজির তুলিয়া রায়বাহাদুর অনায়াসেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, ইংরেজ-শাসনের প্রভাবে আমরা কিরূপে শনৈ: শনৈ: সুসভ্য আত্মসচেতন জাতিতে পরিণত হইতেছি এবং ভবিষ্যতে ক্রমশ কিরূপে সুপক্ক হইয়া অবিমিশ্র স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইব। এখনও যে আমরা অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অসমর্থ আত্মকলহপরায়ণ সুবিধাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া অর্থহীন।''[৯৩]

রায়বাহাদুর এতটাই তোষামোদকারী যে তারই নির্দেশে আন্দোলনকারী জনতার উপর গুলিবর্ষনের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটাকে যখন চিহ্নিত করেন তার নিজেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার পরিবর্তে ছুটে যান কমিশনার ভবনের উদ্দেশে। কারণ : ''নির্বোধ ছেলেটার হঠকারীতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।''[৯৪]

—রায়বাহাদুরের এই আচরণ পাঠককে স্তম্ভিত করে। বনফুল নির্মমভাবে ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন ইংরেজ তোষামোদকারী রায়বাহাদুরকে।

নিয়তির নির্মম পরিহাসে কীভাবে অঘোর রায়ের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল তা আমরা দেখেছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পে। বনফুলের **'আইন'** গল্পে দেখি তার অন্য আরেকটি সংস্করণ। টাকার প্রলোভনে পা দিয়ে ব্যাক ডেটেড মিথ্যা ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রদান করে ডাক্তার টি.সি. পাল জানতে পারলো যে লোকটি একটি খুনী এবং সে নিজেকে আড়াল করার জন্যই তার প্রয়োজন ছিল ডাক্তারী সার্টিফিকেটটি। ডাক্তার টি.সি.পাল তখনও জানতেন না যে কী মারাত্মক খবর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে! ঠিক সেই মুহূর্তেই :

''পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং লম্বা খামে একখানা চিঠি দিয়া গেল।...ডাক্তারবাবু চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সহসা তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পুলিস খবর দিতেছে যে, প্রায় একমাস পূর্বে তাহারা একটি মৃতদেহ একটি ট্রেনের কামড়ায় পায়। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যাইতেছে যে, লোকটির মৃত্যুর কারণ ছুরিকাঘাত। আত্মহত্যা নয়, কেহ খুন করিয়া গিয়াছে। তাহার বা হাতে উল্কি দিয়া নাম লেখা ছিল —'রমেশ'। ইহা ছাড়া শনাক্ত করিবার মত আর কোনও চিহ্ন তাহারা পায় নাই। এখন অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ জানিতে পারিয়াছে যে, উক্ত রমেশ কলিকাতায় মেসে থাকিয়া দালালি করিত এবং সে নাকি ডক্টর টি.সি পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই সংবাদটি সত্য কিনা তাহা যেন ডক্টর পাল পুলিশকে অবিলম্বে জানান এবং যদি সত্য হয় তাহা হইলে রমেশ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য পুলিশের গোচর করিয়া যেন আইনত প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার সহায়তা করেন।''[৯৫]

কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস এই যে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার সহায়তা তো দূরের কথা উল্টে ডাক্তার টি.সি. পাল তাকে আইনের ফাক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সহযোগিতা করলেন।

বনফুল কোন কোন গল্পে সহজ সরল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। **'বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট'** গল্পে ছাপোষা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হলধর হালদার মহাশয় কন্যার বিবাহের ফর্দ করতে গিয়ে খরচ যখন কিছুতেই কমাতে পারছেন না তখন দইয়ের যোগানদার নিধিরামকে দেখে হলধরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। হলধর চিন্তা করে দেখলেন বিশ টাকা মন দরে ভালো দইয়ের পরিবর্তে যদি পাঁচ টাকা মন দরের দই খাওয়ানো যায় তাহলে টাকা পঁচিশেক অনায়াসেই বাঁচানো যায়। হলধর জানতেন এতে তার সম্মান নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা আছে। তাই তিনি অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি দইওয়ালাকে ডেকে বললেন :

''দেখ বাপু নিধিরাম, ওই পাঁচ টাকা মনের দই তুমি দু'মন দিও। কিন্তু একটি কথা আছে।''

''আজ্ঞা করুন।''

''দই খেয়ে যদি কেউ নিন্দে-টিন্দে করে—''

''নিন্দে আজ্ঞে করবেই। পাঁচ টাকা মনের দই, সঙ্গীণ দই হবে হুজুর।''

''হ্যাঁ, তাই বলছি নিন্দে-টিন্দে যদি কেউ করে, তখন তোমাকে ডেকে আমি একটু ধমক টমক দেব। ভাবটা যেন তোমাকে আমি ভালো দই-ই দিতে বলেছিলাম, তুমি যেন আমায় ঠকিয়েছ। তুমি একটু কাঁচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো—ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না।'' কিন্তু এর পরিণতি আশঙ্কাকেও ছাড়িয়ে গেছে কারণ :

''দধি নয়, যেন আগুন!

আহার্য্য দ্রব্যের প্রতিপদেই হলধর কার্পণ্য করাতে বরযাত্রীগনের প্রত্যেকেই এক একটি বারুদের স্তুপে পরিণত হইয়াছিলেন। দধি পড়িতেই সকলে একযোগে ক্ষেপিয়া উঠিলেন।—এরকম দই যে কেউ কোনও ভদ্রলোকের পাতে দিতে পারে তাহা কল্পনাতীত।

পাতা ঠেলিয়া দিয়া সকলে নাকে কাপড় দিলেন।

হলধর করজোড়ে কহিলেন—''দইটা কি—''

''অখাদ্য মশাই—অখাদ্য।''

''তাই নাকি! অথচ আমি ভালো দই ফরমাশ দিয়েছিলাম।''

সহসা হলধরের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। তারস্বরে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—''নিধে—নিধে—''

নিধিরাম নিকটেই ছিল, আসিয়া দাঁড়াইল।

হলধর বলিতে লাগিলেন—''কি দই দিয়েছ তুমি?

''আজ্ঞে দই তো ভালোই।''

''এঁরা তাহলে মিথ্যে কথা বলছেন! বেটাচ্ছেলে হারামজাদা, ঠকাবার আর জায়গা পাওনি তুমি!''

নিধিরাম কাঁচমাচু হইয়া মস্তক অবনত করিল। সম্ভবত আবেগের আতিশয্যেই হলধর কিন্তু থামিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া নিধিরামের গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—''জুয়াচোর, পাজি কোথাকার—''

নিধিরাম মুখ তুলিয়া বলিল—''চড় মারবার তো কথা ছিল না চড় মারলেন যে বড়! আপনারা পাঁচ জন ভদ্রলোক রয়েছেন, বিচার করুন আপনারা—''

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলধর গিয়া প্রাণপণে নিধিরামের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।''[৯৬]

আপাত দৃষ্টিতে এ হাসি সহজ সরল কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই সহজ সরল হাসির অন্তরালে রয়েছে একটি কন্যাদায়গ্রস্থ গরীব পিতার কন্যাদানের প্রবল প্রচেষ্টা। এ কাহিনি তো শুধু হলধর হালদারের নয়। এ কাহিনি আমাদের দেশের প্রতিটি নিম্নবিত্ত সংসারের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার যা অবশ্যই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিষ্টেমের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি।

'মিষ্টার মুখার্জি' গল্পে মিষ্টার মুখার্জি একটি অদ্ভুত চরিত্র। সমাজ সংসারের কিছু মানুষ দেখা যায় যারা আর চার পাঁচজনের থেকে আলাদা। মিষ্টার মুখার্জি সেই ধরণের একটি চরিত্র। মিথ্যেকথাকে কতটা শৈল্পিক ভঙ্গীতে বলা যায় তার বোধহয় জ্বলন্ত উদাহরণ মিঃ মুখার্জি চরিত্র। কখনো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপের কথা, কখনো অষ্ট্রেলিয়ায় তার টেনিস পার্টনার মিস মুলের কথা, কখনো বা আমেরিকার জনৈক কোটিপতির একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। আড্ডাখানার আড্ডাধারীরা তা বোঝে না তা নয় তবুও এমনভাবে তারা মোহিত হয়ে যায় যে সবকিছু বুঝেও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তাদের। দোষটা বোধহয় ওদেরও নয়। কেন না মিথ্যা কথা বলে সম্ভ্রম আদায়ের যে কৌশল মিঃ মুখার্জি রপ্ত করেছেন তাতে শুধু মুগ্ধ হওয়া যায়, প্রতিবাদ করা যায় না। মিঃ মুখার্জি যখন বলেন :

''মহাত্মাজীর সঙ্গে সেদিন দেখা গাড়িতে। থার্ড ক্লাসের একটি কোনে বসে বসে তক্‌লি ঘোরাচ্ছেন—আমাকে দেখতে পেয়ে একটু মৃদু হাসলেন। আফ্রিকার সেদিনগুলো মনে পড়ে গেল বোধহয়।''[৯৭]

তখন এর সবটাই চরম মিথ্যা জেনেও অন্তরের প্রতিবাদী সত্তা গর্জে ওঠার ভাষা পায় না। এর অভিব্যক্তি হয় শুধুমাত্র হাসিতেই। সত্যিই ধন্য মিঃ মুখার্জি। কিন্তু এহেন চরিত্রের সত্যিকারের স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন বনফুল :

> ''একটু দূরে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে মনে হইল একটা লোক হাতে ঝোলানো একটি ব্যাগ লইয়া সদানন্দ মোদক ফিরি করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি মিষ্টার মুখার্জি।''[৯৮]

গল্পকথক বিস্মিত হয়ে গেলেন। আর বিস্মিত গল্পকথককে তার একটি অনুরোধ : ''এ কথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়তো জিনিসটা ঠিক বুঝবে না, ভাববে, হয়তো অভাবে পড়েই—'' তখন হাসির হাওয়া মুহূর্তে বেদনার মেঘে পরিণত হয়।

'ক্যানভাসার' গল্পে ক্যানভাসার হীরালাল দন্ত মাজন ফেরি করে ঘুরে বেড়ায়। একদিন ঘটনাচক্রে সে উপস্থিত হয় ভৈরবদের গ্রামে। ভৈরবকে দেখেই হীরালাল বলে :

> ''মাজন আছে—ভালো দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভালো হয়ে যাবে মশাই—ভালো মাজন আছে—''।[৯৯]

কিন্তু ভৈরব জানে এসব বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মতে হীরালালের মতো লোকেরা দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছে তারা। তাই হীরালালকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে বলে সে। এই নিয়ে বচসা শুরু হয় দুজনের। এই বচসার মধ্যেই ভৈরব প্রচন্ড জোরে হীরালালের মুখে আঘাত করতেই তাঁর বাঁধানো দাঁত চাপাটি খুলে বেরিয়ে আসে। স্তম্ভিত ভৈরব তার কালোকুচকুচে গোফের দিকে দৃষ্ট দিলে হীরালাল বালকসুলভ সরলতায় স্বীকার করে :

> ''আজ্ঞে হ্যাঁ ওটাও। ভালো কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ—এই করেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—''[১০০]

এ ঘটনা একাধারে হাস্যরসাত্মক ও করুণরসাত্মক। যার নিজের দাঁত বাধানো যে নিজের দাঁতের রোগ সারাতে পারে না সে ফেরি করে বেড়াচ্ছে দাঁতের সর্বরোগ নিরাময়ের মাজন। এ দৃশ্য সত্যিই হাস্যরসাত্মক কিন্তু তার করুণ স্বীকারোক্তি আমাদের অন্তর স্পর্শ করে যায়। আর এর সঙ্গে তার বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা যাওয়ার সংবাদ যুক্ত হয়ে করুণরসকে ঘনীভুত করে তোলে। শুধু পাঠকের নয় ভৈরবের মত নিষ্ঠুর মানুষের হৃদয়েও এতে করুণা ও বেদনার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সেও হীরালালকে আর মাজন না কিনে ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

এম.এ তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া এক বেকার যুবকের গল্প **'পাশাপাশি'**। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা করেও চাকরি জোটাতে না পেরে বিকাশ যে অদ্ভুত পন্থা নিয়েছে তা একই সঙ্গে হাস্যকর ও করুণরসাত্মক। বাড়িতে থাকলে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নানা রকম আবদার তার পক্ষে মেটানো বাস্তবিকই অসম্ভব। তাই বড় আপিসে বিনা মাইনেতে অ্যাপ্রেন্টিসি করার মিথ্যা গল্প বানিয়ে ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটি বেঞ্চিতে বসে সারাদিন কাটিয়ে রাত দশটা এগারোটা নাগাদ বাড়িতে ফেরে সে। এটা তার রোজকার রুটিন। এখানেও আছে প্রতিযোগিতা। লেট হয়ে গেলে তারই মতো আরেকজন এসে সেটা দখল করে নেয়। তাই তাকে যতটা তারাতারি সম্ভব সেখানে এসে পৌঁছাতে হয়। ঘটনাচক্রে এই বিকাশের সঙ্গে পরিচয় হয় গল্পকথকের যিনিও কিনা ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় গিয়ে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই বিকাশের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। বিকাশের ব্যস্ত জীবনযাত্রা দেখে হিংসা হয় তার। তিন দিন বিকাশের বাড়িতে কোনও ক্রমে কাটিয়ে পরের দিন সে বিকাশের সঙ্গ নেয় এবং পথে যেতে যেতে বিকাশের মুখ থেকে উক্ত ঘটনা সে শোনে।

মহৎ শিল্পী মাত্রই যুগ সচেতন। তার সমকালকে উপেক্ষা করতে পারেন খুব কম গল্প লেখকই। বনফুলও এর ব্যতিক্রম নন। সমকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আর তারই প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন গল্পে। 'পাশাপাশি' গল্পটি এরকমই একটি গল্প। একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের বেকারত্ব কীভাবে তাকে সংসার জীবন থেকে পলায়নবাদী করে তোলে তা অত্যন্ত কৌতুককরভাবে এখানে দেখিয়েছেন গল্পকার। তবে গল্পের নায়কের অফিস টাইম ধরার জন্য তারাহুরোর মধ্যে যতই কৌতুক থাক এর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বেকারত্বহীনতার তীব্র জ্বালা যা তাকে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণায় দগ্ধ করে। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে যার সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত রচনা করার কথা তাকেই কিনা পলায়ন করতে হয় তাদের কাছ থেকে। গল্পের নায়ক যখন বলে :

> ''বাড়িতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না! সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়ছিল প্রচুর। বাড়িতে থাকলে ডাক্তার-ফাক্তার ডাকতে হত ধার করেও। ছিলাম না নিশ্চিন্ত।''[১০১]

—তখন আপাতদৃষ্টিতে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতার কথা মনে হলেও ঘটনাটি কি একজন অসহায় পিতার কথাও আমাদের স্মরণ করায় না? দুর্ভাগ্য তার পুত্রদেরও। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে? এর সত্যিই কোন উত্তর নেই। বনফুলের এই গল্প পাঠককে সত্যি ভাবায় ও সামাজিক সমস্যার গভীরে নিয়ে যায়।

বনফুল ছিলেন জীবন শিল্পী। আর তাই মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায় তার চোখে ধরা পড়েছিল স্পষ্টভাবেই। তবে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ট পর্যায় যৌবনের প্রতি তার দরদ ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। যৌবনের উদ্দামতা, যৌবনের সীমালঙ্ঘন, যৌবনের অত্যুচ্ছ্বাস ও বিড়ম্বনা —সব কিছুর প্রতিই ছিল তাঁর সহমর্মিতা। **'জৈবিক নিয়ম'** গল্পে বনফুল যৌবনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এইভাবে :

> ''অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে। পেশীগুলির মধ্যে শিহরন সঞ্চারিত হয় শিরায় শিরায়, শোণিত স্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে, বাহুল্যের ওই অতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে-অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাহা নিজস্ব ধরণে, নিজস্ব ভঙ্গীতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।''[১০২]

জৈবিক নিয়ম অনুসারে এভাবেই যৌবন আসে মানুষের জীবনে। 'জৈবিক নিয়ম' গল্পে ''প্লাটফর্মে রোগা গোছের ছোকরাটি তাহার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও যাহা করিতেছিল, তাহা এই সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতেই করিতেছিল।''[১০৩] প্লাটফর্মে বসে থাকা একটি অপরিচিত তরুণীর সামনে নিজের যৌবন প্রদর্শনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সে। কখনো মোটা কণ্ঠস্বরে কুলিকে ডাকা, কখনো সোডা বিক্রেতাকে ডাকা, চানাচুরওয়ালার সামনে বচসা করা এবং তার সমস্ত চানাচুর কিনে নেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মেয়েটির সামনে সে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চাইছিল। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সীমা থাকা উচিৎ। সেই সীমা ছাড়ালে কোন না কোন মূল্য দিতে হয়। ছেলেটির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। এর পরিণতিতে তাকে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হল, নিজের জীবন দিয়ে :

> ''ছোকরা গাড়িতে উঠিয়া জিনিসপত্রগুলি ঠিকমতো রাখিয়া আবার
> নামিয়া আসিল।
> উপবিষ্ট তরুণীটির পানে একবার চাহিয়া দেখিল।
> দেখিল, তরুণীটিও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।
> গার্ড বাঁশি বাজাইয়া বিধিমত সবুজ নিশান নাড়িলেন।
> ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল।
> তখনও ছোকড়া ট্রেনে উঠে না।
> ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশ বাড়িয়াছে তখন সে শেষ

বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য সহাস্যমুখে মেয়েটিকে শেষ নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষনাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গেল।

আর কিছু করিবার সুযোগ সে পাইল না।''[১০৪]

'মুখোশ' গল্পের হাসি হিউমার রসাত্মক। যে ভূতের ভয়ে গল্পকথকের পিসীমা অজ্ঞান হয়ে যায় তা আসলে ভূত নয়, একটি কুচকুচে কালো রঙের মুখোশ। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয় আরোও বড় বিস্ময়ে পাঠক অভিভূত হয় গল্পের পরবর্তী পর্বে। পিসীমা অজ্ঞান হয়ে গেলে যে বিজন সকলের আগে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে সেই বিজনই আসলে সমস্ত ঘটনার মূলে। এ কথা জেনে গল্পকথকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও অপ্রস্তুত হয়ে পরে :

> ''কিছুক্ষণ কেঁদে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে বিজন শেষকালে যা বললে তা আরও বিস্ময়কর। কিছুদিন থেকে অত্যন্ত দুরবস্থা চলেছে তাদের। যদিও বাইরের ভড়ংটা বজায় আছে কিন্তু ভিতরের হাঁড়ি চলছিল না। যে ডাক্তারবাবুটি এসেছিলেন তিনি বিজনের মাসতুতো ভাই। তাঁর অবস্থাও তদ্রূপ। তাই দুজনে মিলে প্যাক্ট করেছে একটা। রোগী জুটিয়ে দিলে রোগী পিছু কমিশন দেবে ডাক্তারবাবু। অনেক ফন্দি করে অনেক রকম রোগী তাকে জুটিয়ে দিয়েছে বিজন। কিন্তু গত সাতদিন থেকে একটিও রোগী জোটাতে পারেনি সে। অথচ সংসারের নিত্য খরচ লেগেই আছে। কাল বউদি বললেন যে, চাল বাড়ন্ত হয়েছে। এ ক'দিন শুধু ভাত জুটছিল, অবিলম্বে কিছু টাকা যোগাড় করতে না পারলে তাও জুটবে না। পিসীমা ভীতু লোক সে জানত, তাই একটা মুখোশ কিনে সে...।
>
> শুনলাম ওই ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামওলাদের সঙ্গেও না কি ডাক্তারবাবুটির কমিশন বন্দোবস্ত আছে।''[১০৫]

—বিজনের এই স্বীকারোক্তি তো আসলে একজন অসহায় বেকার যুবকের প্রচ্ছন্ন বেদনার ইতিহাস। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে বিজনের এই কৃতকর্ম নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় কিন্তু বনফুল তাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করে ফাঁসিকাঠে ঝোলাননি। বরং তার প্রতি প্রকাশ করেছেন হৃদয়ের সহানুভূতি।

'দাঙ্গার সময়' গল্পটি হিউমার রসাত্মক। 'দাঙ্গার সময়' গল্পের বিষয় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই গল্পটি স্মরণ করায় ভারতবর্ষের বুকে একাধিকবার ঘটে যাওয়া হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শোচনীয় পরিনাম কিছুটা কৌতুকছলে বিবৃত করেছেন বনফুল। দাঙ্গার সময় মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কায় যখন হিন্দু গল্পকথক সন্ত্রস্ত, মাস্ অ্যাটাকের আশঙ্কা করে যখন তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঠিক তখনই

আক্রমণকারী মনে করে গল্পকথক ফায়ার করে বসলেন তারই কাছে আগন্তুক হয়ে আশ্রয় নিতে আসা ছেলেবেলার বন্ধু মুসলমান রহিমকে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর রহিম আর্ত কণ্ঠে হাহাকার করে ওঠে :

''ভাই পরেশ, আমি রহিম! পাটনা থেকে আমি মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় পাবো বলে। আমাদের বাঁচাও ভাই। গেট বন্ধ। দেওয়ালের এই ফাঁকটা দিয়ে মা বোধহয় ভেতরে ঢুকে গেছেন—''

এরপর : '' রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে টেনে বার করা হল। দেখা গেল বুলেটটা ঠিক বামস্তন ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।'' [১০৬] গল্পের এই করুণ পরিণতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আড়ালে যে সুস্থ মানবিক সম্পর্কের অপমৃত্যু ঘটে চলে তাকেই বিদ্রূপ করেছেন গল্পকার।

বনফুলের হিউমার রসাত্মক গল্পের মধ্যে **'বেচারামবাবু'** গল্পটি একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। সমাজসচেতন বনফুলের তীব্র সমাজবীক্ষার ফল বলা যেতে পারে গল্পটিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল তাদের করুণ আখ্যান বলা যেতে পারে গল্পটিকে। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনির পরে বেচারামবাবু বাড়ি ফিরে এসে একের পর এক সাংসারিক অভাব অনটনের সম্মুক্ষীন হন। মুদির তাগাদা থেকে আরম্ভ করে ছেলের হষ্টেল চার্জ, বিবাহিত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এবার ভালো তত্ত্ব পাঠানোর আগাম আর্জি, মেজ মেয়ের বিয়ের চিন্তা, স্ত্রীর মুখে অতিথি আগমনের সংবাদ এবং তার জন্য আলো চাল, দুধ এবং আফিং-এর ব্যবস্থা করার জন্য চিন্তা মাথায় নিয়ে যখন শুতে যান বিছানায় তখন দেখেন শীতের ঠান্ডায় শীতবস্ত্র আর লেপের অভাবে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। অসহায় বেচারাম নীরব রইলেন। ''শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রইলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।'' [১০৭]

এ গল্প পাঠ করার পরে বেঁচারামবাবুর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় পাঠকের হৃদয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

'অদূরদর্শী নিমাই' গল্পে হাস্যরস অশ্রু আভাসিত। এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ নিমাই সামন্ত। তার ক্রিয়াকর্ম বড়ই অদ্ভুত। কখনো বোঝাবহনকারী অপরিচিতা বৃদ্ধাকে নিজের পয়সা খরচ করে রিক্সায় তুলে দেন, আবার কখনো হুজুগের বশে তাজমহল দেখতে যান নিজের হাজার টাকার সেগুন কাঠের খাট মাত্র দু'শ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে। কখনো বা ইলিশ মাছ কিনে নেন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কেনা নতুন পামশু মাত্র পাঁচ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে। এসব করেই সে আনন্দ পায়। এমনি করেই হেসেখেলে দিন কাটছিল তার। কিন্তু পূর্ব প্রণয়িণী তবলার উদ্যোগে তারই শ্বশুরবাড়ির নিকটস্থ একটি গরীব ঘরের পাত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়।

বিবাহ বাসরে তবলাও এসেছিল। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের ভিতর শুইয়ে দরজায় শিকল তুলে সে হাজির হয়েছিল বিবাহ বাসরে। নিমাইকে সে পরামর্শও দিচ্ছিল। একটু পরে বর কনে যখন বিয়ের পিড়িতে এবং পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ আরম্ভ করতে যাবেন ঠিক তখনই বাইরে প্রবল হৈ চৈ শোনা গেল। জানা গেল পাশেই আগুন লেগেছে। তবলা আর্তনাদ করে উঠল : ''আমার খোকন যে ওই ঘরে রয়েছে—''[১০৮]

নিমাই বিয়ের পিড়ি থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক :

'' অনেকক্ষণ পর জল নিয়ে যখন আগুন নেবানো হল তখন দেখা গেল অঙ্গার স্তূপের নীচে নিমাই উপুড় হয়ে তবলার খোকাটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। খোকা বেঁচে আছে। কিন্তু নিমাইয়ের মাথা পিঠ গা সব পুড়ে গেছে। সে আর বাঁচল না।''[১০৯]

একটি হাস্যোচ্ছল প্রাণের এই করুণ আত্মত্যাগে পাঠকের মন নিমেষে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

'ছেলেমেয়ে' গল্পটি একই সঙ্গে কৌতুকের আবহে স্নিগ্ধ অন্যদিকে করুণরসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। দুজন আসন্ন প্রসবা মহিলা একজন আন্নাকালী ও অন্যজন নমিতা পাশাপাশি হসপিটালের বেডে শুয়ে পুরুষ জাতের প্রতি নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। অথচ মেয়ে সন্তান প্রসব করে আন্নাকালীই আবার তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। একই ব্যক্তির এই পরস্পর বিরোধী আচরণে কৌতুকের আবহ রচিত হয়। পাশাপাশি এ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে নিয়তির অসহায়তা। পরপর সাতটি মেয়ের পর তাই আন্নাকালী আর্তনাদ করে ওঠে :

''ও আমার মেয়ে নয়, নিয়ে যাও, বদলাবদলি করে দিয়েছ তোমরা।''

বিস্মিত নার্স বলিল—''সে কি কথা, বদলাবদলি করব কেন?''

'' নিশ্চয়ই বদলাবদলি করেছ, আমার মেয়ে হতে পারে না—জ্যোতিষী বলেছে, এবার আমার ছেলে হবে।—''

আন্নাকালীর কণ্ঠস্বর কাপিতে লাগিল।

''এ তোমারই মেয়ে—''

''নানা, আমার মেয়ে নয়, আমার সাত-সাতটা মেয়ে, আর মেয়ে আমি চাই না, আমার মেয়ে হয়নি, আমার ছেলে হয়েছে। নমিতা ডাক্তারের মেয়ে বলে আমার ছেলেটি তাকে দিয়েছ তোমরা।''

''ছি ছি, তাই কখনও হতে পারে! এ তোমারই মেয়ে, নাও কোলে কর।''

''না, মেয়ে আমি চাই না—চাই না—চাই না,—আমার ছেলে এনে দাও, আমার ছেলে এনে দাও—নিশ্চয়ই আমার ছেলে হয়েছে।''

হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আন্নাকালী চিৎকার করিতে লাগিলেন। আর্ত অসহায় চিৎকার।

পাশের খাটে নমিতা সভয়ে তাহার শিশুপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।''[১১০]

আন্নাকালীর এই করুণ আর্তনাদ পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে ক্রন্দনধ্বনি জাগিয়ে তোলে।

বনফুলের অনেকগুলি গল্প রয়েছে যেগুলির সূচনা কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে হলেও সমাপন ঘটেছে করুণরসের আবহের মধ্য দিয়ে। **'গণেশ'** এরকমই একটা ছোটগল্প। গণেশই গল্পের প্রধান চরিত্র। গণেশের চেহারার বিশেষত্ব হল তার ''রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু দুইটি বহির্মুখী, দেখিলেই মনে হয় লোকটা যেন দম বন্ধ করিয়া রহিয়াছে।'' মানুষের চেহারার এই বিশেষত্ব নিঃসন্দেহে হাসির খোরাক জাগায়। তবে গল্পের বিষয় কিন্তু এটা নয়। গল্পের বিষয় রচিত হয়েছে গণেশ, তার স্ত্রী বিভাবতী এবং বিভাবতীর হাতের বালাকে কেন্দ্র করে। অসুস্থ হয়ে তরুণী ভার্যা বিভাবতীর হাতের বালাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়েছে গণেশকে। তারপর গরীব গণেশের পক্ষে স্ত্রীকে বালাজোড়া গড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও পাড়ার অনেকেরই নতুন গড়ানো বালার গল্প স্বামীর কাছে করেন। শিমুলকাটা প্যাটার্ণের নতুন ডিজাইনের বালার সংবাদ দেন স্বামীকে। বিভাবতীর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন স্বামী। কিন্তু বুঝলে কি হবে! তিনি তো নিরুপায়। তাও পরের দিন বিধু স্যাকরার সঙ্গে দেখা করে শিমুলকাটা প্যাটার্ণের বালা গড়ার খরচ জেনে নেন। খরচ দুশ টাকা শুনে পিছিয়ে আসেন। তাও সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন তিনি। মণিবের কাছে গিয়ে দুশ টাকা ধার চান এবং প্রতি মাসে একটু একটু করে তা শোধ করে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু মণিব তো শুনে অবাক। গণেশ প্রতি মাসে বেতনই পায় মাত্র দশটি টাকা। কি করে সেখান থেকে দুশ টাকা শোধ করা সম্ভব! অগত্যা গনেশকে নিরস্ত হতে হয়। হঠাৎ করে সুযোগ আসে গণেশের সামনে। মণিব দিগম্বর আঢ্য তার পুত্রবধুর শিমুলকাটা প্যাটার্ণের বালার আবদার রক্ষা করবার জন্য বিধু স্যাকরাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে একটি বালা গড়াতে দেন। কিছুদিন পর একদিন গণেশ সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে। হাতে এক জোড়া শিমুল কাটা বালা। বিস্মিত বিভাবতীকে নিয়ে হিড় হিড় করে টেনে ঘরে ঢোকে গণেশ সুন্দর একটি রাত্রী যাপনের অভিপ্রায়ে। কিছুক্ষণ পর কিন্তু জানা যায় আসল খবর :

> ''বকুল গাছের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার ফালি বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে। বকুল ফুল ও ল্যাভেন্ডারের উগ্র গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। গণেশ ও বিভাবতী পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে। বিভাবতীর হাতে শিমুলকাটা বালা পড়া।
>
> ''উঃ—উঃ''

গণেশ ধড়মর করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিভাবতীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

''কি হল?''

''রগের কাছে লাগল খুব, তোমার বালার কাঁটায় বোধহয়, এ কি রক্ত পড়চে যে উঃ খুব রক্ত পড়ছে, আলোটা জ্বাল তো—''

বিভাবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল। দেখিল ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। বালার কাটায় রগের স্ফীত শিরা একটা কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিল, ন্যাকড়া দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া গেল। উঠান হইতে দূর্বাঘাস আনিয়া চিবাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইল, ন্যাকড়ায় রেড়ির তেল ভিজাইয়া পুরু করিয়া পটি দিল, আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া রাখিল খানিকক্ষণ, খয়ের গুলিয়া দিল, —কোনও ফল হইল না। রক্ত সমানে পড়িতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দিগম্বর আঢ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বিধু স্যাকরা এবং লালপাগড়ি পুলিস। গণেশের মাথাতেও একটা লাল পাগড়ি ছিল, কিন্তু অত টকটকে লাল নয়, একটু কালচে গোছের লাল। শিয়রে বসিয়া বিভাবতী হাওয়া করিতেছিল।

বিধু বলিল—''এই যে বালা—আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এল আপনার নাম করে। আমিও দিয়ে দিলাম, এতদিনের পুরোনো চাকর আপনার, ভাবতেই পারিনি—''

চোরাই মাল পাওয়া গেল, চোরকে কিন্তু ধরা গেল না। কয়েক মিনিট পূর্বেই গনেশ মারা গিয়াছিল। বিভাবতী বুঝতে পারে নাই, সে মৃত স্বামীকেই বসিয়া হাওয়া করিতেছিল।''[১১১]

—গল্পের এই পরিণতি কিন্তু সত্যিই করুণরসাত্মক।

'নীলকণ্ঠ' গল্পে প্রধান চরিত্র নীলকণ্ঠবাবু। তাঁর মত বিদ্বান লোক খুব একটা দেখা যায় না। ইউরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন পড়িয়েছেন। ফরাসী, জার্মানী, ইংরেজী ভাষায় ভালো বইও লিখেছেন। অথচ নীলকণ্ঠবাবুর উপর শহরের কেউ প্রসন্ন নন তার স্পষ্ট অহংকারী স্বভাব ও স্পষ্টবাদিতার জন্য। তা সত্ত্বেও শহরের অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায় তাকে সভাপতির পদে রাখতে হল স্বয়ং কমিশনার সাহেবের ইচ্ছায়। নীলকণ্ঠবাবু প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন। অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত সময়ে তিনি এলেন না। এ নিয়ে সভায় ফিসফিসানি ও তুমুল হট্টগোল চলতে থাকে। অবশেষে তিনি এসে পৌছান। নানা অনুষ্ঠান চলার পর সভাপতি সাহিত্য বিষয়ে একটি সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং ঠিক সময়ে সভায় না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। নিমেষে সভায় আগত অতিথিবৃন্দের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যখন তিনি জানান :

''তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি কিছুদিন ছিলেন, তিনি হঠাৎ চলে গেলেন, তাঁর বিদায়কালীন ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেল একটু। সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।...

সভা শেষ হয়ে যাবার পর জানা গেল তাঁর একমাত্র ছেলেটি ঠিক সাড়ে চারটের সময় হার্টফেল করে মারা গেছে। সে নাকি অনেকদিন থেকে হৃদরোগে ভুগছিল।''[১১২]

(৪)

বনফুলের হাস্যরসাত্মক গল্পগুলির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য। এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে বোধহয় বাংলা সাহিত্যের আর কোন ছোটগল্পকার গল্প লেখেননি। হাস্যরসের গল্প তো নয়ই। ব্যক্তিগত জীবনেও বনফুল একঘেয়েমি পছন্দ করতেন না। নিজের আত্মজীবনী গ্রন্থে সে কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।

''আমার একটা স্বভাব, আমি একঘেয়ে ব্যাপার বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারি না। উপর্যুপরি একইরকম তরকারী খাইতে পারি না।

...লিখিবার বেলাতেও আমার এই স্বভাব ক্রমশ: নিজেকে জাহির করিতে লাগিল।'' [১১৩]

আত্মজীবনীর অন্যত্র তিনি বলেছেন :

''আমি চেষ্টা করিতাম, যাহাতে আমার দুটি বই যেন এক স্বাদের না হয়। নাম করিব না, তবে, অনেক বড় বড় নামজাদা লেখকের একঘেয়ে লেখা পড়িয়া মনে হইত এরূপ চর্বিত চর্বণ করিয়া লাভ কি। ইহাতে লেখকের হয়ত কিছু আয় বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি হয় না।''[১১৪]

এই মনোভাবই লেখক বনফুলকে বৈচিত্র্যবিলাসী করে তুলেছিল। হয়তো এ কারণেই বনফুলের গল্পের উদ্যানে এত বিচিত্র রংএর বিষয়ের ছড়াছড়ি। হাস্যরস সৃজনের দিক থেকেও বনফুল একইরসের কারবারী নন। তাঁর হাস্যরস কোথাও ব্যঙ্গধর্মী আবার কোথাও বা করুণরসের স্পর্শে অশ্রুসজল। তবে হাস্যরসের ধরণ যাইহোক না কেন তাঁর হাস্যরসের গল্পগুলি কখনোই পাঠককে সরসতার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলে না, বরং একধরণের মৃদু হাসির হাল্কা হাওয়ায় পাঠকের হৃদয়ে স্নিগ্ধ কৌতুকের আবেশ সৃষ্টি করে। জীবনের আনাচে কানাচে যতরকম অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলিকে টেনে বার করেছেন বনফুল। হাস্যরসের মোড়কে পরিবেশন করেছেন পাঠকের সম্মুখে একটিও কথা অপ্রয়োজনীয় না বলে। উদ্দেশ্য তো অবশ্যই আছে। কোন হাস্যরসই উদ্দেশ্য

বর্জিত হতে পারে না। বনফুল **'অহঙ্কার পাঁড়ে'** নামে একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছেন :

> ''প্রধান মুশকিল, অধিকাংশ লোকই অহঙ্কার পাঁড়েকে চিনতে পারে না প্রথমে। বিনয় কুমার বা ওই ধরণের কিছু একটা ভেবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যায়। তারপর ইঁট খেয়ে পালিয়ে আসে। অহঙ্কার পাঁড়ের দু হাতে এবং চার পকেটে যে অনেক ইঁট মজুত থাকে সর্বদা, এ খবরও অনেকে জানে না। কারন ইঁটগুলোও অদৃশ্য। অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যখন নাকে বা রগে লাগে তখন চমকে যেতে হয়।'' [১১৫]

—বনফুলের অধিকাংশ হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের মূলকথা হল এই।

জীবনের নানা অসঙ্গতিকে নিয়েই যখন হাস্যরসিকের কারবার তখন সে অসঙ্গতিগুলির সঙ্গতি বিধানের একধরণের সুপ্ত প্রয়াসও হাস্যরসিকের মনের অদৃশ্য অন্তরলোকে জাগরুক থাকে। বনফুলেরও নিশ্চয়ই সে রকম উদ্দশ্য ছিল। তবে সে উদ্দশ্য কোথাও প্রকট নয়। একধরণের অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় বনফুল জীবনের বহু নির্মম দিককে গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। সময়ে সময়ে চরম নিষ্ঠুরতাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নিজে থেকেছেন নিরাসক্ত। এই নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বনফুলের গল্পরস আরও জমে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে স্যাটায়ার, হিউমার প্রভৃতি প্রচলিত হাস্যরসের ধরণগুলিকে ছাপিয়ে সেগুলি হয়ে উঠেছে আইরোনিকাল। তাই মোহিতলাল মজুমদার সঙ্গত কারণেই বনফুলকে তাঁর গল্প সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> ''এগুলিতে লেখকের অনাসক্তি বা কঠিন আত্মসংযম আছে, মানুষকে দায়ী করা নয়, —জীবন বিধাতার নির্মম রসিকতাকেই ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'যুগল স্বপ্ন', 'বলহরি হরিবোল', 'ভৈরবী ও পূরবী', 'খেঁদি' প্রভৃতি এইরূপ রচনা। Thomas Hardy-র 'Life`s Little Ironies` মনে পড়ে—তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ আপনার এই গল্পগুলি।'' [১১৬]

মানুষকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে জীবনের প্রতি উদার দৃষ্টি না থাকলে, প্রাণধর্মের গূঢ়তম রহস্যের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ না থাকলে 'Lifes Little Ironies`গুলি উপলব্ধি করা যায় না। বনফুলের এই দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি মহৎ শিল্পী। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় এক ভিন্ন ধরণের কারবারি তিনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উল্লেখসূচি :

১) 'পশ্চাৎপট', বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৪, পৃ. ১২।

২) তদেব, পৃ. ২০।

৩) তদেব, পৃ. ৩৯।

৪) তদেব, পৃ. ৪২।

৫) তদেব, পৃ. ৪২।

৬) বনফুল : জীবন, মন ও সাহিত্য, ড. ঊর্মী নন্দী, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমারলেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা-১৯৯৭, পৃ. ৮।

৭) 'পশ্চাৎপট', বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ৯৩।

৮) তদেব, পৃ. ১০৫।

৯) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ: পৃ. ১২৭।

১০) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ: পৃ. ৬৭০-৬৭১।

১১) 'পশ্চাৎপট', বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৪, পৃ. ১৮৪।

১২) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ: পৃ. ১০২।

১৩) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১০২-১০৩।

১৪) 'পশ্চাৎপট', বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ : ২০১৪, পৃ. ১০৮।

১৫) বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯ শে জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ২৭।

১৬) 'পশ্চাৎপট', বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৪, পৃ. ১০৮।

১৭) তদেব, পৃ. ২১৯-২২০।

১৮) বনফুলের ফুলবন, সুকুমার সেন, সাহিত্য লোক, ৫৭এ, কারবালা-ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০, পৃ. ২০।

১৯) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০১৫, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

২০) 'পশ্চাৎপট', বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ১০৪।

২১) স্মৃতিচিত্রণ, পরিমল গোস্বামী, মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৬৪।

২২) 'হনুমান সিং', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

২৩) 'ঋণ শোধ', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

২৪) তদেব।

২৫) তদেব।

২৬) তদেব।

২৭) 'মাত্র দশটি টাকা', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

২৮) 'দর্জি', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

২৯) 'বৈষ্ণব-শাক্ত', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩০) তদেব।

৩১) তদেব।

৩২) 'চতুরীলাল', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র

৩৩) ক.'জগমোহন', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৩) খ. তদেব

৩৩) গ. 'প্রস্তর সমস্যা', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৪) 'স্মৃতি', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৫) 'ভদ্রলোক', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৬) 'শ্রীধরের উত্তরাধিকারী, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৭) 'বাল্মীকি', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৮) 'বাইজোভ', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৩৯) 'শিল্পীর ক্ষোভ', বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪০) ‘বিবেকী শিবনাথ’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪১) ‘বাঘা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪২) তদেব।

৪৩) ‘বাঘা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৪) ‘দ্বিবা-দ্বিপ্রহরে’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৫) ক. ‘বিদ্যাসাগর’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৫) খ. তদেব।

৪৬) ক. ‘ঘরে বাইরে’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৬) খ. তদেব।

৪৭) ক. ‘দেশী ও বিলিতী’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৭) খ. ‘যুগান্তর’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৮) ‘শ্রীপতি সামন্ত’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৪৯) তদেব।

৫০) তদেব।

৫১) স্ত্রী চরিত্র, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৫২) ‘শরশয্যা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৫৩) তদেব।

৫৪) ‘শরশয্যা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৫৫) ‘দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৫৬) তদেব।

৫৭) ‘দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৫৮) ‘অতীতের রাণী’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৫৯) ‘ছুঁড়িটা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৬০) তদেব।

৬১) তদেব।

৬২) ‘গহিন রাতে’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৬৩) ‘প্রভু-ভৃত্য’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৬৪) তদেব।

৬৫) ‘খেঁকি’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৬৬) তদেব।

৬৭) তদেব।

৬৮) তদেব।

৬৯) তদেব।

৭০) ‘দুইরকম স্বাধীনতা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৭১) তদেব।

৭২) স্বাধীনতার জন্ম

৭৩) তদেব।

৭৪) তদেব।

৭৫) ‘অদ্বিতীয়া’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৭৬) তদেব।

৭৭) ‘ট্রেনে’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৭৮) তদেব।

৭৯) তদেব।

৮০) ‘জাগ্রত দেবতা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৮১) ‘প্রমাণ’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৮২) তদেব।

৮৩) ‘দুই খেয়া’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৮৪) ‘অনুবীক্ষন’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৮৫) ‘অভিজ্ঞতা’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৮৬) তদেব।

৮৭) ‘দুধের দাম’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৮৮) তদেব।

৮৯) ‘নদী’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯০) ‘মালিয়া’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯১) ‘মুগুর’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯২) ‘বিশু আর ননী’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯৩) ‘সেকালের রায় বাহাদুর’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯৪) তদেব।

৯৫) ‘আইন’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯৬) ‘বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯৭) ‘মিষ্টার মুখার্জি’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

৯৮) তদেব।

৯৯) ‘ক্যানভাসার’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০০) তদেব।

১০১) ‘পাশাপাশি’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০২) ‘জৈবিক নিয়ম’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০৩) তদেব।

১০৪) তদেব।

১০৫) ‘মুখোশ’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০৬) ‘দাঙ্গার সময়’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০৭) ‘বেচারামবাবু’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০৮) ‘অদূরদর্শী নিমাই’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১০৯) তদেব।

১১০) ‘ছেলেমেয়ে’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১১১) ‘গণেশ’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১১২) ‘নীলকণ্ঠ’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১১৩) ‘পশ্চাৎপট’, বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৪, পৃ. ১৮৯।

১১৪) তদেব।

১১৫) ‘অহঙ্কার পাঁড়ে’, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র।

১১৬) বনফুলকে লেখা মোহিতলালের চিঠি, পশ্চাৎপট, বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৪, পৃ. ২৬০।